প্রথমে একজন বুড়ার শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করেন। তিন মাস পরে দেখা যাইল যে, বুড়া বয়সেও তাহার দেহের শক্তি অত্যন্ত বাড়িয়াছে, তাহার গায়ের শ্লথ চামড়া আবার মসৃণ ও দৃঢ় হইয়াছে ও তাহার মাথার নূতন কাল চুল গজাইয়াছে। দ্বিতীয় বারে এক জন বাহাত্তর বয়সের বুড়া লোকের দেহে অস্ত্র প্রয়োগ করেন, তাহার ফলও ঠিক প্রথমটির মত হইয়াছে। তৃতীয়বারে ৬১ বৎসরের এক বুড়াকে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দেখেন পাঁচ মাস পরে তাহার দেহের বার্দ্ধক্য জনিত কম্প বন্ধ হইয়া গেল ও সে যুবকের ন্যায় তাড়াতাড়ি পাহাড়ের উপড় উঠিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিল না। এমন করিয়া ২৬ বার মানুষের দেহের স্থান বিশেষে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসকেরা সফলমনোরথ হইয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের আশ্চর্য্য রকম মানসিক ও দৈহিক উন্নতি দেখা গিয়াছে।

গত কয়েক বৎসরে অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মনিতে বিখ্যাত চিকিৎসকগণ ও এই বিষয় লইয়া অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা মানুষের চির যৌবন লাভের প্রাচীন কল্পনা আবার নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

মানুষ যে পুনর্ব্বার নব-যৌবন লাভ করিতে পারে, আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন চিকিৎসাও তাহার প্রমাণ। অশীতিপর মহাবৃদ্ধ চ্যবন এই রসায়ন চিকিৎসার সাহায্যেই তো আবার নব যৌবন লাভ • করিয়াছেন। ইউরোপের সুধী চিকিৎসকগণ যে চিকিৎসার নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় সেই রসায়ন চিকিৎসার অন্তর্গত হইবে।

লোকক্ষয়ে আতঙ্ক—সম্প্রতি ফরাসী দেশে জন্ম-মৃত্যুর তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত যুদ্ধকালের মধ্যে ফ্রান্সের লোক সংখ্যা ৪০০০০০০ চল্লিশ লক্ষ কমিয়াছে। সিনপ্রদেশের কাউন্সিল জেনারেলকে উদ্দেশ করিয়া দরিদ্রের দুঃখ মোচন বিভাগের ডাইরেক্টার বলিয়াছেন যে, এখন ফরাসী জাতিকে বাঁচাইতে হইলে সেখানে যাহাতে জন্মসংখ্যা বৃদ্ধি পায়—তাহার ব্যবস্থা করুন! এতো আর বাঙ্গালা দেশের বচনসর্ব্বস্ব বাবুদের কথা নহে। সেখানে যখন এরূপ একটা কথা উঠিয়াছে তখন নিশ্চয় উহা কার্য্যে পরিণত হইবে। যেমন জর্ম্মনি। ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত জর্ম্মানির লোক সংখ্যা ছিল প্রায় চারি কোটী। ফ্রান্স—প্রুসিয়ান যুদ্ধের পর জর্ম্মান বিশেষজ্ঞরা বুঝিলেন, যে জর্ম্মানের লোক সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। তখন তাঁহারা দেশবাসী দিগকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে জর্ম্মানের লোক সংখ্যা প্রকাশ পাইয়াছিল ৯ কোটীরও কিছু অধিক! অতএব দেখা-যাইল যে, ৪৫ বৎসরের মধ্যে জর্ম্মান জাতি—যত্নে ও চেষ্টায়—লোকসংখ্যা দ্বিগুণেরও—অধিক বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন। আমাদের দেশে এই—জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এজন্য কি হইতেছে? ইহার চেষ্টা কখনো হইবে না। হইবার নয়। বাঙ্গালায় ইহা হইতে পারে না।

আশার কথা—গত ২৬শে মাঘ মঙ্গলবার বঙ্গীয় "ব্যবস্থাপক সভার" এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন নবাব স্যার সামশুল হুদা। প্রথমে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। তাহার পর

রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রস্তাব করেন যে, প্রতি জেলার প্রত্যেক থানাতেই একটী করিয়া "দাতব্য ঔষধালয়" খোলা হউক এবং প্রতি থানায় ত্রিশ টাকা মাহিনার তিনজন করিয়া চিকিৎসক নিযুক্ত করা হউক। ইহা-দের মাহিনার অর্দ্ধেক টাকা গবর্ণমেণ্ট দিবেন ও অর্দ্ধেক টাকা জেলাবোর্ড হইতে দেওয়া হউক। তিনি আরও বলেন যে "আমি জানি যে কলিকাতা হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে এক স্থানে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। লোকে রোগের ভয়ে রোগী দিগকে একলা ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। যাহারা মরিয়া গেল, তাহাদিগকেও কেহ পোড়াইল না। গভমেণ্টের প্রথম কর্ত্তব্য দেশবাসীদিগকে ঔষধ ও চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য করা।—এইকার্য্যে টাকায় প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু মন্ত্রীদের মাহিনা ও তাঁহাদের দপ্তর ঠিক রাখিবার জন্য যত টাকা ব্যয় হইবে সেই টাকায় প্রায় দুই হাজার চিকিৎসক এই কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এ প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছে আমরা ইহার জন্ম প্রস্তাব কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

চীনে অন্নাভাব—চীন দেশেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। চীনের অধিবাসিগণকে দুভিক্ষা-নল ভীষণভাবে দহন করিতেছে। কিন্তু সেও তো আমাদের মত বচনবাগীশের দেশ নহে, সেখানে ইহার জন্য রীতিমত চেষ্টা চলিতেছে। কিরূপ চেষ্টা হইতেছে শুনুন,—

লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া পিকিনের বৃটিশ ফেমিন রিলিফ কমিটীর কোষাধ্যক্ষ ভারত-বাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রকাশ, সম্প্রতির বড়লাট বাহাদুর ভারতে করদ রাজগণকেও সর্ব্বসাধারণকে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত চীনবাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বাস্তবিক ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করা আমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু ভারতে যে চির দুর্ভিক্ষ!

অনাহারে মৃত্যু—সম্প্রতি এসিয়ান রিভিউ পত্রে প্রচারিত হয় যে ১৯১৮ অব্দে ৩ কোটী ২০ লক্ষ ভারতবাসীর অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। ডাইরেক্টর অফ্ ইনফরমেশন জানা-ইয়াছেন; যে ১৯১৮ সালে সমগ্র ভারতে এক জনেরও অনাহারে মৃত্যু হয় নাই। স্বীকার করি, সিভিল সার্জ্জনের সার্টিফিকেট ব্যতীত অনাহারীর মরা সাব্যস্থ হয় না। কিন্তু শস্যহানি হইলে সেই বৎসর যদি মোট মৃত্যু সংখ্যার অনৈসর্গিক বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহা হইলে স্বল্পাহার ও অনাহার প্রসূত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হয় বলিয়া একটা অনুমান করা ও হয় না। ১৯১৮ সালে ভারতে সস্যোৎ-পন্ন কম হইয়াছিল এবং মৃত্যুর অনুপাতে জনসংখ্যা প্রত্যেক সহস্রে ৬২ হইয়াছিল। জ্বরে মৃত্যু হয় ১ কোটী ১০ লক্ষ। ১৯১০ অব্দে মৃত্যুর সংখ্যা হয় ৮৫ লক্ষ।

"নদীয়া জেলা রোর্ডের বিজ্ঞাপন।—নদীয়া জেলারোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান মাসিক ৪০ টাকা বেতনে ৫ জন সব এসিণ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করিবার জন্য বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, চিকিৎসকগণ নিম্নলিখিত স্থানে থাকিবেন।

১। কীলগঞ্জ—থানা কালীগঞ্জ।

২। আনন্দধাম—থানা রানাঘাট।

৩। বামন্দাদ—থানা গেউগনি।

৪। হয়রবাদ—থানা চুয়াডাঙ্গা।

৫। চাঁদপুর—থানা কামারখালি।

মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে ৩ জন হোমিও প্যাথ চিকিৎসক নিযুক্ত হইবেন। ২৫ এ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রার্থিগণের আবেদন গৃহীত হইবে। নদীয়া জেলাবোর্ডের এই সদুদ্দেশ্যের জন্য আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু আমাদের কথা এই যে, তাঁহারা যদি ইহার ভিতর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে তদ্দারা নদীয়ার কল্যাণ হইত। যশোহর জেলাবোর্ড যখন যশোহরে দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের স্থাপনা করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদের জন্য কুমিল্লা জেলাবোর্ড যখন মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে ৫ বৎসরের জন্য বৃত্তি দিয়া আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ছাত্র পাঠাইতে পারেন—কংগ্রেসে যখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারে ও তাঁহারা বলিতেছেন যে "বিদেশীয় চিকিৎসা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের দেশীয় "আয়ুর্ব্বেদ" মতে চিকিৎসা প্রবর্ত্তন করা হউক।" তখন আমরা আশা করিতে পারি নাকি যে, প্রত্যেক জেলা বোর্ড হইতে "আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের" প্রতিষ্ঠাও হইবে।

জেলাবোর্ডের প্রতি সঞ্জীবনীয় উপদেশ—১। প্রত্যেক গ্রামের পচা পুকুর সংস্কার বা ভরাট। ২। কদর্য্য জল যাহাতে কোন স্থানে জমিয়া না থাকে তাহার উপায় করুন। ৩। জঙ্গল কাটিয়া গ্রামের মধ্যে সূর্য্যের কিরণ ও বাতাসের চলাচলের বব্যস্থা করুন। ৪। পায়খানায় জল ও গোময় হিনের স্থানের জল সরবরাহ করুন। ৫। প্রত্যেকের বাটীতে যাহাতে পায়খানা থাকে তাহার উদ্যোগ করুন। ৬। ওলাউঠা, বসন্ত ও ইনফ্লুয়েঞ্জা আরম্ভ হইলে প্রত্যেক গৃহস্থের কি করা কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ দিন—৭। গর্ভবতী নারীর কি নিয়ম পালন করিতে হয় ও সূতিকাগৃহ যেরূপ হওয়া উচিত তাহা শিক্ষা দিন। পুষ্টিকর—আহারের অভাবে রোগবৃদ্ধি হইতেছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। গোজাতির উন্নতি, গোচারণ ভূমিরক্ষা, পুকুর ও বিলে মৎস্য জন্মান, গৃহস্থদিগের ফল উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বেলাবোর্ড সমূহে নবযুগে মানুষের প্রাণে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দেশকে সুখ ও স্বাস্থ্য দান করিয়া আনন্দ দান করুন।

গুপ্তিপাড়ায় দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা—গত ২৪সে মার্চ্চ বর্দ্ধমান বিভাগের মাননীয় কমিশনার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্ত এম, এ, আই, সি, এস মহাশয় গুপ্তিপাড়ায় শ্যামাচরণ দাত্যব্য ঔষধালয়ের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্ণি শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সেন মহাশয় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এই দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত করায় গ্রামবাসীর বিশিষ্ট অভাব দূর করিলেন। সতীশবাবু প্রায় ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা ব্যয়ে ষ্টেশন হইতে একটী পাকা রাস্তা করাইয়া গ্রামবাসীর আর একটী অসুবিধা দূর করিয়াছেন। আমরা সতীশবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আশা করি দেশের ধনকুবেরগণ সতীশবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন। দাতা শতং জীবতু"

জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের চিকিৎসা বিদ্যালয়।—ন্যাসেন্যাল এজুকেসন বোর্ড ছাত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত

করিবেন। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানি সকল প্রকার চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইবে। সকল প্রকার ছাত্রদেরই পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা, শবব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি শিখিতে হইবে। প্রথমে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ "কার্টে'স ম্যানসলেই" ছাত্রদের ক্লাস বসিবে স্থির হইয়াছে। সুখের কথা।

চিকিৎসকের বদান্যতা—কলিকাতার ডাক্তার শ্রীযুক্ত আজত নাথ দে চৌধুরী মহাশয় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাহায্যার্থ তিন বৎসর কাল মাসিক তিন শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

স্কুল-কলেজ ত্যাগী ছাত্রগণের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ।

—:০:—

১। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু অন্যায় ব্যবহার ও বলপ্রয়োগ সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে।

২। অসহযোগিতার আদর্শগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

৩। স্কুল কলেজ ত্যাগ করিলেও গৃহে পাঠ ত্যাগ করিবেনা, যে সকল পুস্তক পাঠে স্বদেশ-প্রীতি জন্মে এবং চিন্তাশীলতার বৃদ্ধি হয়, এই-রূপ পুস্তক পড়িবে। নিয়মিতরূপে সংবাদ পত্র পড়িবে। জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করিবে না।

৪। মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া মাতৃভাষার উন্নতি করিবে।

৫। চরিত্রবল ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। চরিত্রহীন ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক হইবে, দেশের দুর্গতি তত বেশী হইবে। অতএব হৃদয়ের বৃত্তিগুলিকে সুপরিচালিত কর।

৬। এ কর্ম্মযোগের দিনে, কর্ম্মের সাধনভূত শক্তির সাধনা কর। ইস্পাতের মত দৃঢ় শরীর চাই, বাবুগিরীর শরীরে কোন কাজ হইবে না। স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া শরীরটীকে তৈরী কর।

৭। পরিশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা কর। ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া বৃথাভিমান করিও না। মনে রেখো, এ অভিমান পরাধীনতারই নামান্তর। কাজ, সব কাজই সমান। কর্ম্মী কখনো কর্ম্মের বড় ছোট বিবেচনা করেন না।

৮। রেল ষ্টীমারে যাতায়াত করিতে হইলে তৃতীয়শ্রেণীতে যাইবে। সামর্থ্য থাকিলেও উচ্চতর শ্রেণীতে যাতায়াত করিবে না।

৯। গবর্ণমেণ্টের চাকরীর মোহ ত্যাগ করিবে। কৃষি শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি করিয়া দেশের উন্নতি করিবে। রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া তবে ব্যবসায়ে হাত দিবে।

১০। কষ্টসহিষ্ণু হও। বিলাসিতা ত্যাগ কর, ফ্যাসন ও আরামপ্রিয়তা ছাড়িয়া দাও। আরামপ্রিয়তা—ব্যক্তিগত ও স্বাধীনতার ঘোর শত্রু।

১১। দেশের স্বার্থে নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দাও। পশুর ন্যায় নিজ শরীরটী লইয়া ব্যস্ত রহিও না। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় কর এবং তাহা দেশের কাজে নিয়োজিত কর।

১২। স্বদেশী ব্রত গ্রহণ কর। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়-জামা পরিয়া সুখী হও! বিদেশী দ্রব্যে বাবু সাজিও না। কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া, এ হত দরিদ্র দেশের অর্থ বিদেশে পাঠাইও না।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

করপোরেসনের সাহায্য।—আমরা আনন্দের সহিত সাধারণকে জানাইতেছি যে, কলিকাতা করপোরেশন হইতে আয়ুর্ব্বেদ কলেজে বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল, এবৎসর ১৯২১—১৯২২ সালের জন্য ঐ সাহায্যের পরিমাণ সাড়ে তিন হাজার করিয়া দেওয়া হইবে সাব্যস্থ হইয়াছে। আমরা এইরূপ সাহায্য বৃদ্ধির জন্য করপোরেশনের সকল কর্ত্তৃপক্ষের নিকটই কৃতজ্ঞ।

ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন।—আয়ুর্ব্বেদ কলেজ হইতে এবার যে ১৪টি ছাত্র চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা যে সর্ব্ব প্রকার চিকিৎসার সাফল্যসাধন ঘটিবে ইহা সুনিশ্চিত। "অমৃতবাজার পত্রিকা"র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয় এই ছাত্রগণের দ্বারা দেশের প্রকৃতই উপকার হইবে বিবেচনায়—দেশীয় রাজন্যবৃন্দ এবং মফঃস্বলে জেলা বোর্ডের সাহায্যে ভারতের সকল প্রদেশে ইহাদিগকে পাঠাইয়া উৎসাহ প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন। পীযূষ বাবু—স্বর্গীয় শিশির বাবুর সুযোগ্য পুত্র, শিশির বাবু চিরকাল দেশের সেবা করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। পীযূষ বাবু উপযুক্ত পুত্রের কার্য্যই করিতেছেন।

আমাদের কথা।—এই প্রসঙ্গে আমরা দেশের রাজন্যবৃন্দ ভিন্ন সাধারণ ধন-কুবেরদিগেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আধিব্যাধির লীলা নিকেতন বাঙ্গালা দেশের বহু অর্থ পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের সাহায্যে ডাক্তারী ঔষধের জন্য বিদেশে চলিয়া গিয়া থাকে। আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের সাহায্যে যাহারা চিকিৎসিত হইবেন, তাহার ফলে আমাদের ছাত্রগণ ডাক্তারদের মত শল্য চিকিৎসাতেও সাফল্যলাভ দেখাইতে পারিবে, অথচ বিদেশীয় ঔষধ—এমন কি তুলা, গজ প্রভৃতির সাহায্যও লইতে হইবে না। রাজন্যবৃন্দ এরূপ চিকিৎসকদিগকে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের সম্পদবৃদ্ধি করুন সে তো সুখের কথা, তা' ছাড়া দেশের ধনী সম্প্রদায়ও আগেকার মত এই সকল চিকিৎসকদিগকে গৃহচিকিৎসক রূপে নিযুক্ত করিয়া নিজের এবং স্বদেশের স্বাস্থ্য বিধানের উপায় বিধান করুন।

হিন্দুর কর্ত্তব্য। আমরা হিন্দু,—হিন্দুর নিকট পুণ্য সঞ্চয়ের প্রধান উপায় দানের ব্যবস্থা। আবার এই দানের মধ্যে প্রাণী সমূহের জীবনদানের মত ধর্ম্ম নাই। কারণ শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন,—

ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমম্।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—সকলেরই মূল হইল আরোগ্য সম্পাদন। ইহা ইহা শাস্ত্র বলিবেন কেন, সহজবোধ্য কথাও বটে। অতএব আমাদের কুবের সম্প্রদায় আবার পূর্ব্বেরমত গৃহচিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থায় দেশের লোকের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া অক্ষয় ধর্ম্ম সঞ্চয়ের উপায় করুন ইহার জন্য আমরা সকলেরই করুণদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৫ম বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৭—চৈত্র। ৭ম সংখ্যা।

এরণ্ড-মহিমা।

(ইতিহাস)

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

"যস্মিন্ দেশে দ্রুমোনাস্তি
এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"—

এই কথা বলিয়া যে অজ্ঞাতনামা কবি এরণ্ডের অমর্য্যাদা করিয়াছেন,—তাঁহার "অমূল্য সময়" উদ্ভটকল্পনার পরিচর্য্যায় নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়াছে। আমরা বেশ বলিতে পারি—এই অন্তর্ভেদী ধিক্কার "এরণ্ডের" মহত্বকে একটুও সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই। এরণ্ডের অসীম বিরাট গুণসত্ত্বার মধ্যেই সে অবজ্ঞার অন্তর্জ্জলি হইয়া গিয়াছে। মহর্ষিগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে—'আয়ুর্ব্বেদের' অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে এরণ্ড এক মহৌষধ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এরণ্ডের ভেষজ-মহিমার অল্পাধিক আলোচনা করিব।

আমাদের পাঠকগণ সকলেই এরণ্ড বৃক্ষ দেখিয়াছেন, কেননা ইহা ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এরণ্ড স্বচ্ছন্দ বনজাত উদ্ভিদ হইলেও, পূর্ব্বে এদেশের লোক রীতিমত ইহার চাষ করিত। এরণ্ডের ব্যবসায় বিদেশের বহু অর্থে ভারত-লক্ষ্মীর রত্নমঞ্জুষা পূর্ণ করিয়া রাখিত। যদিও এ সকল ঘটনার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, তথাপি এরণ্ডের ইতিহাস আমাদিগকে একটু অনুসন্ধান করিতে হইবে।

দু' এক জন বিদেশী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভারতের এই পুরাতন এরণ্ডকেও "পরদেশী" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের ধারণা—এরণ্ডের জন্মস্থান প্রাচীন মিশর দেশ। মিশরের "মী"র বাক্সে এরণ্ডের বীজ দেখিতে পাইয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

পুরাকালে মিশরবাসীরা মৃতদেহ সযত্নে রক্ষা করিত। শবের উদরে নানাবিধ মসলা

ও গন্ধ দ্রব্য দিয়া উহাকে পাথরের সিন্ধুকে পূরিয়া রাখিত ;—সেখানকার বায়ু শুষ্ক বলিয়া ঐ দেহ পচিয়া যাইত না। যে সকল মানুষ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঁচিয়া ছিল, মিশরে এরূপ শবও এখনও অবিকৃত রহিয়াছে, তাহা কেবল শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়াছে মাত্র— কোন রকমে ক্লিন্ন হয় নাই। এইরূপ শব যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। ইহারই নাম "মমী"। এই "মমী" যে বাক্সে থাকে সেই বাক্সকে "সার কো ভেগস্" বলে। সার কো ভেগসের ভিতর মমীর সঙ্গে যব, গম, বস্ত্র, লেখা কাগজ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দেওয়া হইত। ইহার মধ্যে নাকি এরণ্ডের বীজও পাওয়া গিয়াছে। অতএব এরণ্ড মিশরের জিনিষ! কিন্তু এ প্রমাণ প্রচুর নহে। বরং ইহার দ্বারা এইটুকু বুঝা যায়—প্রাচীনকালে মিশরবাসীরা এরণ্ডের চাষ জানিত। হেরো ডোটাস্, প্লিনি, ভিওডোরাস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালে মিশরবাসীরা এর-ণ্ডকে "কিকি" বলিত। *

আমাদের বিশ্বাস—এরণ্ডের জন্মস্থান আমাদের এই ভারতবর্ষ। আমাদের প্রমাণ সংস্কৃত ভাষায় এরণ্ডের অনেকগুলি নাম। যথা ;—এরণ্ড, গন্ধর্ব্বহস্ত, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, উরু বুক, রুবুক, রুবক, চিত্রক, চঞ্চু, পঞ্চাঙ্গুল, মণ্ড, বর্দ্ধমান, ব্যাড়ম্বক, বুক, অমণ্ড, আমণ্ড, কান্ত, তরুণ, ব্যড়ন্দন, শুক্ল, বাতারি, দীর্ঘ-পত্রক, উত্তানপত্রক, ত্রিপুটীফল, চিত্রবীজ, স্নেহপ্রদ, কোষ্ঠরেচন—ইত্যাদি। আকার, গুণ, পরিবর্ত্তন রহস্যাদি দেখিয়া—ইহার এই-রূপ নানাবিধ নামকরণ হইয়াছে। এরণ্ড যদি এ দেশের জিনিষ না হইত,—প্রাচীন ভারতবাসিগণ কখনই ইহার এত নাম রাখি-তেন না।

দেশ ভেদে নাম ভেদ।

এরণ্ডের বাঙ্গালা নাম—ভেরেণ্ডা ও রেড়ি। বাঙ্গালার কোন কোন প্রদেশে-- ইহাকে "তেল ভেরেণ্ডা" ও "গাব ভেরেণ্ডা" বলে। হিন্দী নাম—অরণ্ড, রাণ্ড। সাঁওতালী নাম—এরডম। আসামী—এড়ি। নেপালী —অরেটা, লেপ্‌চা—রকলোপ। মাগধী— রেড়, লেড়, অণ্ড। উড়িয়া—গাব, গোণ্ড, মেরিণ্ডা। মারহাটী—এরেণ্ডী। তেলেগু— এরা মুডপু। তামিল—অমনকম্, কোটমুট। কর্ণাটী—হরালু। ব্রহ্ম—কেশু। সিংহলী— এণ্ডারু। চীন—পীমা। পুস্ত—অরহস্ত। পারস্য—বসাঞ্জির, বেদাঞ্জির। আরব্য— খিরওয়া।

এই সকল নামান্তর লইয়া আলোচনা করিলেও বেশ বুঝা যায়-ভারতীয় আধুনিক ভাষা সমূহের ভিতরেও এরণ্ডের নানা নাম প্রচলিত এবং ঐ সকল নামের অধিকাংশই "এরণ্ড" শব্দের রূপান্তর মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—প্রাচীন মিশর ভাষার এরণ্ডের নাম ছিল—"কিকি"। প্রাচীন লাটিন ভাষাতেও—এই নাম গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই নাম পরিত্যক্ত হয়। তাহার

* মমীর সিন্দুকে যে এরণ্ড-বীজ পাওয়া গিয়াছে তাহা ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বের, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মাটিতে রোপণ করায় উক্ত বীজ হইতেও অঙ্কুর বাহির হইয়াছে।

পরই এরণ্ডের লাটিন নাম হয়—Ricinus (রিসিনাস) এক রকম বিচিত্র বর্ণ-গাত্র, কীট—রিসিনাস্ নামে বিখ্যাত ছিল। এরণ্ডের বীজ ঠিক এই কীটের মত বলিয়াই, এরণ্ডের নাম রিসিনাস্ রাখা হয়।

পূর্ব্বে য়ুরোপের লোক এরণ্ডের ব্যবহার জানিতেন না। প্রায় ৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে—টরণার সাহেব এরণ্ডের বীজ হইতে তৈল বাহির করেন। বলা বাহুল্য সাহেব বিদেশ হইতে এই বীজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কর্ম্মবীর টরণার তখন এরণ্ড তৈলের এক লম্বাচোড়া নাম দিয়াছিলেন—Oleum cicinumvel ricininum. ওলিয়াম কিকিনাম ভেল রিসিনিয়াম্। টরণার সাহেবের পরে জিবারড নামক আর একজন সাহেব এরণ্ড তৈলকে—Oleum cicinum (ওলিয়াম কিকিনাম) নামে অভিহিত করেন। তাহার পর এরণ্ড তৈলের নাম হয়—Oleum de cherue (ওলিয়াম দে চেরুয়া)—এই সময় "পামাকিরস্ট" জিরাসোল নামেও—কেহ কেহ এই তৈলকে অভিহিত করিতেন।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে—জ্যামেকা দ্বীপে এরণ্ডের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত। সেখানে পোর্ত্তুগীজ ও স্পেনের বণিকগণ—এরণ্ডকে Casto (ক্যাষ্টো) বলিয়া ডাকিত। ঔষধে ব্যবহৃত Vitexagne's custus (ভাইটেক্‌স্ অ্যাগনস্ ক্যাস্টাস্) নামক উদ্ভিদ—দেখিতে ঠিক এরণ্ডের মত; উভয় বৃক্ষ অভিন্ন ভাবিয়া,—বণিকগণ ক্যাষ্টো নামে এরণ্ডেরও নামকরণ করিয়াছিল। এই সকল বণিক—য়ুরোপের সর্ব্বত্রই এরণ্ডবীজের আমদানি করে। সেই সময় হইতেই, ভারতের এরণ্ড ও জ্যামেকায় 'ক্যাষ্টো'—'ক্যাষ্টর' নামেই য়ুরোপে পরিচিত হইয়া পড়ে। এখন য়ুরোপের বিজ্ঞানে 'ক্যাষ্টর অয়েল' একটী প্রয়োজনীয় মহৌষধ। কিন্তু বহুযুগ পূর্ব্বে—ভারতের চিকিৎসক মণ্ডলী ইহাকে মহৌষধ রূপেই পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিব।

জাতি।

উদ্ভিদকে জীবজগতের রক্ষাকর্ত্তা মনে করিয়া—যে ভারতের ঋষি—"য ওষধীষু যো বনস্পতিষু—তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ' বলিয়া বিশ্বদেবতাকে সমগ্র বনস্পতির মাঝে ভক্তি ভয়ে প্রণাম করিয়া ছিলেন;—সেই ভারতের উদ্ভিদবিজ্ঞান এখন লুপ্ত প্রায়! শুনিতে পাই—"লক্ষণ টিপ্পনী" ও "দ্রব্য চিহ্নম" নামে দুই খানি জীর্ণ ও কীটদষ্ট পাণ্ডুলিপি এখনও পশ্চিমাঞ্চলে পড়িয়া রহিয়াছে, ঐ উভয় গ্রন্থে উদ্ভিদের পরিচয় ও শ্রেণী-বিভাগ আছে। বোধ হয় উহাই আমাদের উদ্ভিদ বিজ্ঞানে—"শিবরাত্রির সলিতা।" দুঃখের বিষয়—গ্রন্থ দুই খানি রক্ষা করিবার জন্য কোন "দেশহিতৈষী"ই চেষ্টা করিতেছেন না! যাঁহারা "আয়ুর্ব্বেদের" রক্ত শোষণ করিয়া জলৌকার মত স্ফীত হইয়াছেন, প্রাচীন গ্রন্থের দিকে তাঁহাদের অনেকেরই ভ্রূক্ষেপ নাই! এখন উদ্ভিদের পরিচয় জানিতে হইলে ইয়ুরোপের শরণাগত হইতে হইবে, শ্বেতর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"এই ভূমণ্ডলে অসংখ্য উদ্ভিদ আছে। অতএব নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বা চিহ্ন এবং সৌসাদৃশ্য

ধরিয়া তৎসমুদয় শ্রেণী, জাতি, বর্ণ, গণ, প্রকার ইত্যাকারে বিভক্ত না হইলে—উদ্ভিদ্ সকলের বিশেষ বিশেষ স্বভাব কখনই জ্ঞাত হইতে পারা যাইত না, এবং তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিবরণ অপরের গোচর করিতে পারা যাইত না।"

এ কথা গুলি যে সময়ের, আমাদের মধ্যে উদ্ভিদ বিদ্যা তখনও যে ভাবে ছিল আজও ঠিক সেই ভাবেই আছে, একটুও উন্নত হয় নাই। যাঁহাদের পেটের ভাবনা নাই, ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মীর কোলে বসিয়া যাঁহারা নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করেন, তাঁহারা যদি উদ্ভিদ শাস্ত্রের অলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও আনন্দ লাভ হয়, দেশেরও একটা অভাব ঘুচিয়া যায়। কিন্তু আমার এই ছোট খাট নিবেদন—নিশ্চয় অরণ্যে রোদন।

য়ুরোপের নির্দ্দেশ অনুসারে এরণ্ডের জাতি, নির্ণয় করিতে হইলে এরণ্ডকে Euphorbiacea (ইউবর বিয়েসি) নামক জাতিভুক্ত করিতে হয়। বিলাতের জীবন্ত বিজ্ঞানে—এরণ্ড ইউফর বিয়েসি জাতির রিসিনাস্ পরিবারে স্থান লাভ করিয়াছে। তাই ইহার নাম—"রিসিনাস্ কমিউনিস্।

স্বরূপ।

এরণ্ড বৃক্ষ সকলেই দেখিয়াছেন, তথাপি ইহার স্বরূপ বর্ণনা করা প্রয়োজনীয় মনে করি।

এই গাছ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকারের দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে—ইহা কুড়ি পঁচিশ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। কোথাও বা দুই হস্তের অধিক পরিবর্দ্ধিত হয়না। সচরাচর আমরা এরণ্ডগাছ দৈর্ঘ্যে ৭।৮ হাত উচ্চ দেখিতে পাই। ইহার কাণ্ড-ফাঁপা, চিক্কণ, গোলাকার, কোমল ও লোমশূন্য। উপরিভাগ ঈষৎ রক্তবর্ণ। পত্র বৃহৎ ও বিপর্য্যস্ত। পত্রবৃন্ত দীর্ঘ, বক্র ও শুভ্রচূর্ণানুলিপ্ত। পত্র ঈষৎ নিম্নমুখ, উপহণ সংযুক্ত, ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ, বহু ভিন্ন পুষ্পগুচ্ছক, পুংকেশর ও গর্ভকেশর—ভিন্ন ফুল। ফল; ত্রিকোষ, কোমল-কণ্টকময়। পক্কাবস্থায় এই ত্রিকোষ ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া বীজ বাহির হয়। বীজ—চেপ্টা, চিক্কণ, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। কোন গাছের বীজ বড় হয় কোন গাছের বা ছোট হয়। বড়বীজের ইংরাজী নাম—Fructas Major এবং ছোট বীজের নাম Fructas minor—এই ছোট বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈলই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে—এরণ্ড ৪ প্রকার। ১। শুক্ল, ২। রক্ত, ৩। অকণ্টক, ৪। ত্রিরেখা। শুক্ল ও রক্ত এরণ্ডে কোন পার্থক্য নাই কেবল বর্ণ বিভিন্ন। "অকণ্টকের" পত্র বিভিন্ন প্রকার, ফল বৃহৎ—কণ্টক হীন। ত্বক্ ছেদন করিলে এক রকম পিচ্ছিল বিস্বাদ রস বাহির হয়। এই জাতীয় এরণ্ডে—উদ্যানের বেড়া হইয়া থাকে। ত্রিরেখার বৃক্ষ—ক্ষুদ্র, পত্র—সবুজ ও রক্তবর্ণ মিশ্রিত, পত্রবৃন্তে চট্ চটে আঠা থাকে, ফল—কণ্টক শূন্য—তিনটী রেখায় বিভক্ত। নদীতীরে, ক্ষেত্রে,—এই গাছ যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

এরণ্ডের মূল, পত্র, শাখা, নির্য্যাস্ বীজ পুষ্প এবং তৈল—সমস্ত অঙ্গই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তৈল নিষ্কাশন প্রণালী।

এরণ্ডের ফল বেশ পাকিলে তাহা সংগ্রহ করিয়া, ছায়ায় ২।৩ দিন শুকাইয়া লইতে হয়। শেষ এই সংগৃহীত ফলগুলি একটী মাটির

গর্ত্তে রাখিয়া গোবর জল (অল্প জলে কিঞ্চিৎ গোময় গুলিয়া লইলেই গোবর জল প্রস্তুত হয়) সেচন করিয়া, তাহার উপর থ'লে চাপা দিতে হয়। ৩ দিন পরে ফলগুলি বাহির করিয়া, রৌদ্রে দিয়া লবু দণ্ডের সাহায্যে ফলের উপর আঘাত করিলে অতিশীঘ্রই খোসা হইতে বীজ পৃথক হইয়া পড়ে। এই সকল বীজ খোলায় অল্প ভাজিয়া ঢেঁকী বা হামানদিস্তায় কুটিয়া লইতে হয়। পরে কুট্টিত বীজ জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে বীজের তৈল জলের উপর ভাসিতে থাকে। জল হইতে ঐ তৈল উঠাইয়া লইয়া আর একবার মৃদুজ্বালে পাক করিলে, জল টুকু মরিয়া গিয়া কেবল তৈল অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এরণ্ড বীজ হইতে তৈল বাহির করিবার পূর্ব্বে —বীজ গুলি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া লইতে হয়। যে বীজের ভিতরকার শস্য পীতাভ, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। নতুবা —একটী মাত্র পীতাভ বীজ থাকিলে, সমস্ত তৈল বিবর্ণ হইতে পারে। বিশুদ্ধ তৈলের বর্ণ —শুভ্র।

বীজ বাছা হইয়া গেলে —খোলায় তাহাকে ভাজিতে হয়। তৈলের বর্ণ, বিশুদ্ধিতা এবং উপকারিতা—অনেকটা ভাজার উপর, নির্ভর করে। বীজ গুলি অধিক জ্বালে 'থরিয়া' না যায়, অথচ কাঁচাও না থাকে—ভাজিবার সময় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকা চাই। তাড়াতাড়ি না করিয়া —ধীরে সুস্থে সন্তর্পণে ভাজিতে হয়। পূর্ব্বে বোধ হয় নিষ্কর্ম্মা লোকেই এই কাজ করিত। তাই কর্ম্মহীনকে বিদ্রূপ করিয়া বাঙ্গালায় প্রবাদ রচিত হইয়াছে—"লোকটা ভেরেণ্ডা ভাজিতেছে।" "আয়ুর্ব্বেদের" চতুর সম্পাদক—আজ এই অধমকে দিয়াও ভেরেণ্ডা ভাজাইয়া লইতেছেন! ভবিষ্যতে হয় ত প্রবন্ধের ছলে—তৈল ও বাহির করিবেন!

ঘানীর সাহায্যেও এরণ্ড বীজ নিষ্পীড়িত করিয়া তৈল বাহির করা যায়। কিন্তু এরূপ তৈলে—এরণ্ডের রূক্ষ স্বভাব (Acridity) বর্ত্তমান থাকে। ইহা সেবনে পাকস্থলী ও অন্ত্রে প্রদাহ জন্মিতে পারে। অতএব যে তৈল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইবে, সে তৈল —কুট্টিত বীজ জলে সিদ্ধ করিয়াই—বাহির করা কর্ত্তব্য।

এখন আর এ সব বালাই নাই। এখন কলে তৈল প্রস্তুত হয়। ইহাতে এরণ্ড বীজ ভাজিবার আবশ্যক হয় না। এই কল অর্থাৎ লৌহ নির্ম্মিত প্রেসের সম্মুখেই আগুন জ্বালিবার স্থান আছে। কল চালাইবার সময়— আগুনের উত্তাপ এরণ্ড বীজের গায়ে লাগে, তাহাতেই তৈল নিঃসরণের সাহায্য হয়। কিন্তু cold drawn নামক তৈল বাহির করিতে —অগ্নির ব্যবহার নিষিদ্ধ। কোল্ড্ ড্রন তৈল অত্যন্ত তরল ও পরিষ্কার। এই শ্রেণীর তৈল প্রস্তুত করিবার সময়—বীজ হইতে সমস্ত তৈল নিষ্কাসিত করা হয় না, আন্দাজ বার আনা রকমের তৈল বাহির হইলেই বীজ গুলি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ব্যবসায়িগণ—এই পরিত্যক্ত সিঠার মায়াও সহসা ছাড়িতে পারেন না, তাঁহারা ইহা হইতেও আবার তৈল বাহির করেন। এই তৈল ৩নং তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহা প্রদীপে জ্বালাইবার জন্যই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। "কোল্ড্ ড্রন" তৈল ছাড়া-বাজারে ৪, রকম তৈল দেখিতে পাওয়া

যায়। ১নং, ২নং, ৩নং, এবং সাধারণ (Ordinary)।

এখন এরণ্ড তৈলের আদর দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। কেরসিন তৈল বাহির হওয়ায়—এরণ্ড তৈল আর কেহ বড় একটা জ্বালাইতে চাহে না। অনেক গৃহ হইতে প্রদীপের তিরোভাব ঘটিয়াছে। ফলে—"এ বি পড়া ডবি" ছেলের দল—অল্প বয়সেই চস্‌মা ধরিতেছেন। পূর্ব্বে-এরণ্ড তৈল কল কব্জার কার্য্যে লাগিত, এখন আমেরিকার মাটী হইতে উৎপন্ন এক প্রকার সুলভ তৈল আবিষ্কৃত হওয়ায় সেই অপূর্ব্বই তৈলই এরণ্ডের স্থান অধিকার করিয়াছে। তবে কলির ধন্বন্তরিগণ এখনও নাকি বঙ্কিম-বর্ণিত ব্যাধি ইষ্টিরসে হইলে কোষ্ঠ রসে প্রয়োগ করেন, আর সাহেবীয়ানার অনুকরণে বাবু ও বাব্বীগণ * চুলের শোভা বাড়াইবার জন্য "সেণ্টেড্ ক্যাষ্টর অয়েল" মাথায় মাখেন,--মৃতকল্প এরণ্ড তৈলের পক্ষে—এতটুকুই এখন অস্তিমের ভরসা।

প্রত্যেক অঙ্গের গুণ।

এইবার এরণ্ডের ভেষজগুণের উল্লেখ করিব। এরণ্ডের সর্ব্বাংশই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। একে একে তাহা দেখাইতেছি।

মূল। এরণ্ডের মূল দুগ্ধ ও জলের সহিত ক্ষীরপাকের বিধানে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে জ্বর, গর্ভিণীর জ্বর, প্রবাহিকা (আমাশয়) সরক্ত প্রবাহিকা (রক্তামাশয়), কৃমিজাত উদরের যন্ত্রণা, শূল, আমশূল, মলবদ্ধ জনিত পেটের কামড়ানি, পিত্তশূল (গলষ্টোন) এবং উদরাধ্মান প্রশমিত হইয়া থাকে। এরণ্ড মূলের ক্বাথ-যমানী চূর্ণ সহ সেবনে আমবাত, শুঁঠ চূর্ণের সহিত সেবনে শূল রোগ লবণের সহিত সেবনে গুল্মরোগ এবং মেথী চূর্ণের সহিত সেবনে ঋতু কালের যন্ত্রণা সত্বই নিবারিত হইয়া থাকে। এরণ্ড মূল বাটিয়া মধু দিয়া মাখিয়া রাত্রে রাখিয়া দিবে; প্রাতঃকালে রস বাহির করিবে। সেই রস পান করিলে মেদবৃদ্ধি জনিত স্থৌল্য রোগ কিছুদিনের মধ্যেই নষ্ট হইতে পারে। পুরাতন প্লীহা, যকৃতে, চর্ম্মরোগে এবং বায়ু প্রধান প্রকৃতির দৌর্ব্বল্যে, এরণ্ড-মূলের ছাল মহৌষধ

কাণ্ড। এরণ্ড বৃক্ষের কাণ্ডের ভিতর কতক গুলি ছোলা পূরিয়া ৩ দিন রাখিবে। ঐ ছোলা চিবাইয়া খাইলে শ্বাস-কৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। এরণ্ডের কাণ্ডে কটু তৈল পূর্ণ করিয়া উষ্ণ করতঃ, সেই তৈলে কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল, (কান কট্‌কটানি) ভাল হয়।

পত্র। এরণ্ডপত্র শয্যায় বিছাইয়া শয়ন করিলে পিত্তজ্বর, প্রবল দাহ এবং কোষ্ঠ রোগ ভাল হয়। এরণ্ডপত্রের পুটপক্করস, তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া, ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূলের নিবৃত্তি হয়। এরণ্ড পত্রের রস ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষুতে দিলে চোঁখাউঠা" ভাল হয়। এরণ্ড পত্র অগ্নিতে সেঁকিয়া উষ্ণাবস্থায় স্তনের উপর স্থাপন করিলে —স্তনকীল (ঠুনকো) ও তাহার যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দূর হয়। উষ্ণ এরণ্ড পত্র--বস্তি দেশে স্থাপন করিলে—রজঃস্রাব হইয়া বাধকের দারুণ যন্ত্রণা ও প্রশমিত হয়! ৫।৭টী এরণ্ড পত্র দুই সের আন্দাজ জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধাবশিষ্ট

* ইন্দ্র নাথের ব্যাকরণ মতে—বাবু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে বাব্বী হইয়া থাকে। রূপ-ঠিক সাধু শব্দের মত।

থাকিতে নামাইয়া, সেই জলে স্তন দ্বয় ধৌত করিয়া,—স্নিগ্ধ এরণ্ড পত্র স্তনের উপর কিছুক্ষণ ধারণ করিলে—স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ায়—গাভীর স্তনেও দুগ্ধ বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে। ঘৃত ভর্জ্জিত এরণ্ড পত্র ভক্ষণে রাতকানা ভাল হয়।

পত্র বৃন্ত। এরণ্ডের পত্রবৃন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া—সূত্রের সাহায্যে মালার মত গাঁথিয়া সেই মালা গলায় পরাইয়া দিলে—শিশুর দন্তোদ্ভবকালীন পীড়া—প্রশমিত হয়।

ফল। এরণ্ডের ফল ৩টী—ছেঁচিয়া—ন্যাকড়ার পুঁটলীতে বাঁধিয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে—একদিন অন্তর পালাজ্বর বন্ধ হয়।

বীজ। এরণ্ড বীজ ২তোলা, আধ পোয়া দুগ্ধ ও আধসের জল দিয়া পাক করিয়া, দুগ্ধাবশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই দুগ্ধ পান করিলে—পিত্তজ উদরী ভাল হয়। ছাগ দুগ্ধে এরণ্ড বীজ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ চক্ষুতে দিলে—চক্ষুরোগ ভাল হয়। এরণ্ড বীজের পায়স ভক্ষণ করিলে—কোমরের বাত ভাল হয়। এরণ্ড বীজ দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তের ব্যথা প্রশমিত হয়। পারাবত বা ঘুঘু পক্ষীকে পক্ষকাল পর্য্যন্ত এরণ্ডবীজ খাইতে দিয়া, সেই পক্ষীর মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিলে মেহ ও পক্ষাঘাত আরোগ্য হয়। বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোঁড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

ক্ষার। এরণ্ড পত্র অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষার—ত্রিকটু চূর্ণ, তিলতৈল ও পুরাতন গুড়ের সহিত মিশাইয়া অবলেহ করিলে—কাস রোগ ভাল হয়। ক্ষার হিং ও অন্নমণ্ডের সহিত ভক্ষণ করিলে—মেদ বৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে প্লীহা কমিয়া যায়।

তৈল। এরণ্ড তৈল একটী উৎকৃষ্ট বিরেচন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে—দশমূলের কাথ, উষ্ণজল, নারিকেলোদক, দুগ্ধ, গোমূত্র ও ত্রিফলার ক্বাথের সহিত এই তৈল পানের ব্যবস্থা দেখা যায়। ডাক্তারী মতেও ইহা একটী নির্দ্দোষ জোলাপ।

এই তৈল সেবনের ২।৩ ঘণ্টা পরেই বিরেচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এবং বিনা ক্লেশে তরল মল নির্গত হইয়া থাকে। ইহা সেবনে কোষ্ঠকাঠিণ্য, প্রবাহিকা, জ্বর, বাত, আমবাত, কুষ্ঠ, মূত্রাধারের প্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত অশ্মরী, অন্তস্থ কৃমি, অন্ত্রের উত্তেজনা, শূল, গুল্ম, বিবমিষা, প্রভৃতি নানা উপসর্গের শান্তি হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বহু রোগেই ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। এরণ্ড তৈল পানে যকৃতের কার্য্যশক্তি বৃদ্ধি হয় না, অনেক সময় অন্ত্রের অবসাদ উপস্থিত হয়, এই জন্য বিরেচনের পরই কোষ্ঠ বন্ধ হইতে পারে। তাই ঋষিগণ ত্রিফলা চূর্ণের সহিত এরণ্ড তৈল পানের পরামর্শ দিয়াছেন। অতি শিশুকে, গর্ভিণী নারীকে এবং জীর্ণ রোগীকেও ইহা সেবন করিতে দেওয়া চলে। এরণ্ড তৈলের সহিত গুগ্‌গুলু ভক্ষণ করিলে বাতের কন্‌কনানি অল্পক্ষণের মধ্যেই কমিয়া যায়। এরণ্ড তৈল পেটে মালিশ করিলে সূতিকা গৃহের শিশুর বিরেচন হইয়া থাকে। শৈশব পূতনা, শৈশব আক্ষেপ, শৈশব প্রতিশ্যায় এরণ্ড তৈলের বিরেচনে আরোগ্য হইয়া থাকে। মাতা

এরণ্ডতৈল পান করিলে, তাঁহার স্তন্য পানে স্তন্যপায়ী শিশুরও কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। দুগ্ধের সহিত একমাস কাল এরণ্ড তৈল পান করিলে কোষবৃদ্ধি রোগ ভাল হয়। যষ্টিমধুর কাথের সহিত ইহা সেবন করিলে পিত্তশূল ও পিত্তকোষের পাথুরী জনিত যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ উপশমিত হইয়া থাকে। এরণ্ড তৈল চক্ষে দিলে চক্ষুর রক্তবর্ণ, করকরানি, জলপড়া, ক্ষীণ দৃষ্টি প্রভৃতি উপসর্গ নষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্গুণ ছাগীদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া এরণ্ডতৈল পান করিলে, সন্নিপাত জ্বর, জ্বরাতিসার, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগজাত অন্ত্রের পচন ক্রিয়া নিবারিত হয়। এরণ্ডতৈল স্থানিক প্রয়োগে দগ্ধব্রণের দাহ, সদ্যব্রণের শোণিত স্রাব, তরুণ ও পুরাতন বাতের স্নায়বিক বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

এই তৈল অঙ্গে মাখিলে অঙ্গ পুষ্ট এবং কেশে মাখিলে কেশ বৃদ্ধি হয়। মেষ পালকগণ মেষের গাত্রের পশম বৃদ্ধি করিবার জন্য মেষকে ইহা মাখাইয়া থাকে।

চরকের যুগে—এরণ্ড তৈলের পানের মাত্রা—চতুষ্পল অর্থাৎ অর্দ্ধ সের পরিমাণ ছিল। এখনকার লোকে বড় জোর ১ ছটাক তৈল খাইতে পারে। চরকের প্রাচীনত্বের ইহা একটী প্রমাণ।

এরণ্ডের খৈল—ইক্ষু, আলু প্রভৃতির পক্ষে উত্তম সার। জমীতে ইহার সার প্রয়োগ করিলে—শীঘ্রই সস্তারের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এরণ্ডের পত্র ভক্ষণে আসাম অঞ্চলের রেশমকীট প্রতিপালিত হয়। এই কীটজাত সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র—পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হইলেও নষ্ট হয় না। এরণ্ড পত্র ভক্ষণকারী কীটের নাম,—"এড়ি"।

সাঁওতালী চিকিৎসকগণ-এরণ্ড গাছের কয়লার আগুণে—ধনুষ্টঙ্কার রোগীকে স্বেদ দিয়া থাকে। হাকিমগণ—পক্ষী বিশেষকে এরণ্ড বীজ খাওয়াইয়া পালন করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস,—এইরূপ পালিত পক্ষীমাংস অত্যন্ত কামোদ্দীপক। কবিরাজী মতে—অনেক ঔষধ এরণ্ড পত্রে বেষ্টন করিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন তৈল এরণ্ড তৈলে পাক করিতে হয় এবং গুগ্‌গুলু জাত বাতনাশক দুই চারিটী ঔষধ—এরণ্ড তৈলে মর্দ্দন করিতে হয়। কিন্তু সে সকল কথা সবিস্তারে লিখিতে গেলে—পুঁথি বাড়িয়া যায়', অতএব এই স্থানেই এরণ্ড মহিমার উপসংহার করিতেছি।

নিরামিষ আহার।

[শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, কবিভূষণ]

—:•:—

মানবদেহের ক্ষয় বৃদ্ধি এমন কি উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, পর্য্যন্ত সমস্তই অন্নপান মূলক। আমারা যে কোন কাজ কর্ম্ম করি না কেন আমাদের শরীরের কিয়দংশ তাহাতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মানবদেহে সর্ব্বদাই এই ক্ষয়-বৃদ্ধি ক্রিয়া চলিতেছে। শরীরকে ক্ষয় হইতে

রক্ষা এবং শারীরিক পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত আমাদের আহারীয় দ্রব্যের প্রয়োজন। আহারই প্রাণরক্ষার মূল, শরীর অন্নরস হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা প্রতিদিন যে সকল দ্রব্য ভোজন করি, সেই সকল ভুক্ত পদার্থ পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতুতে পরিণত হইয়া থাকে। উদরস্থ অগ্নি দ্বারা পচ্যমান রস অবধি মজ্জা পর্য্যন্ত ছয় ধাতুতে মল জন্মে, কিন্তু সহস্রবার দগ্ধ মল বিরহিত স্বর্ণের ন্যায় রস ধাতু বারংবার পক্ব হইয়া শুক্রধাতুতে পরিণত হইলে নির্ম্মল হইয়া থাকে। এই শুক্র ধাতুই মানব দেহের জনয়িত্রী শক্তির মূল উপাদান। শরীরের সার পদার্থ শুক্র ধাতুর পোষণ ক্রিয়া দ্বারাই মানবের ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সংযম শুক্র ধাতুর পোষণ ক্রিয়া সাধনের প্রধান উপায়। যিনি ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা শুক্র ধাতু রক্ষা করেন, তাঁহার দৈহিক ও মানসিক শক্তি বিশিষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শারীরিক ও মানসিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়। শরীরের সার পদার্থ-বন্ধন— শুক্র ধাতু অযথা ব্যয়িত ও নষ্ট হওয়া অপেক্ষা মানব জীবনের অধিকতর দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? সংসারে বহু সাধনালব্ধ দুর্ল্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সংযম শিক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে অতীব প্রয়োজনীয়। ইন্দ্রিয় সংযমের অভাবে নিরন্তর মানব সমাজে ক্রমশঃ হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল, রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য ও অল্পায়ুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

পুরাকালে ভারতবাসী আশ্রম ধর্ম্মোচিত শিক্ষা প্রভাবেই প্রবৃত্তিমার্গমূলক, রজঃ তমো গুণদ্দীপক, বিলাস বাসনা বর্দ্ধক, আহার বিহারাদি পরিত্যাগ করতঃ সাত্ত্বিক আহার বিহারে প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয় সংযমে অভ্যস্থ হইতেন, তজ্জন্যই সে সময়ে ভারতে স্বাস্থ্য সম্পদ, সুখ-শান্তি—পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। রোগ শোক ও অকাল মৃত্যুর বাহুল্য এবং ব্যসন-জাত নিত্য নূতন উৎকট রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না।

এখনও অস্মদ্দেশে কোনরূপ দৈব বা পৈতৃক কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে সংযম করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। অসংযত ভাবে থাকিলে উদ্দেশ্য বিফল হইবে, এই জন্য পূর্ব্ব দিবস এক সন্ধ্যা নিরামিষ বা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধ ও সংযতাবস্থায় থাকিতে হয়। কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ ও সংযত হইয়া পরে দৈব বা পৈতৃক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

আত্ম সংযম দ্বারা শক্তি সঞ্চয় ও কার্য্যে সাফল্যলাভ অবশ্যম্ভাবী, এই জন্যই লোক-হিতব্রত আর্য্য ঋষিগণ এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছিলেন। ইহপরকালব্যাপী আমাদের এই জীবন মহাব্রতের কঠোর কর্ত্তব্য-সাধন নিমিত্ত আত্ম সংযম দ্বারা শক্তি সঞ্চয় ও পুরুষাকারে সাফল্যলাভ অবশ্যম্ভাবী, এই জন্যই লোক হিতব্রত আর্য্য ঋষিগণ এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

রিপুপরবশ ব্যক্তি প্রবৃত্তিমার্গে পরিচালিত হইয়া বিবেক ও কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হয়, সুতরাং সংসারে কোনরূপ মহৎ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়না। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির জীবন

পুণ্যময়, পবিত্রতার আধার, তিনি বিঘ্নবহুল সংসারকর্ম্মক্ষেত্রে অনায়াসেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়সংযমজনিত অমিত শক্তি ও শারীরিক-মানসিক পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আহারীয় দ্রব্যের বিশুদ্ধিতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আহারীয় দ্রব্যের দোষগুণ ভেদে শরীরের উৎকর্ষ অপকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। অন্নপান ভোজনই জীবদেহের সমস্ত শুভাশুভের কারণ।

আমরা যেরূপ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করি, ভুক্তপদার্থের সেই সকল গুণাবলী আমাদের শরীরে সংক্রমিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মক ; সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপভোগ্য শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধাদি বিষয় সমূহ মধ্যে কোনটী দ্বারা সত্ত্বগুণের, কোনটী দ্বারা রজোগুণের, কোনটী দ্বারা তমোগুণের বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে।

"সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানঃ রজসো লোভএবচ
প্রমাদ মোহোজায়েতে তমসোঽ জ্ঞানমেবচ"

সত্ত্বগুণের বাহুল্যে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, রজঃ ও তমোগুণের বাহুল্যে লোভ, প্রমাদ, মোহ, ও অজ্ঞানতা উপস্থিত হইয়া থাকে। আহারীয় দ্রব্য আমিষ ও নিরামিষ ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে প্রবৃত্তিমার্গমূলক আমিষ আহার জীবের দুঃখ ও রোগপ্রদ। অনেকেই বলিতে পারেন—মৎস্য মাংস ইত্যাদি ত্যাগ করিলে শরীর রক্ষা কিরূপে হইবে ? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আমাদের শরীর অভ্যাসের বশীভূত, আমাদের কামনাপূর্ণ স্বভাবই যত অনিষ্টের মূল। কামনার সংস্কার সাধিত হইলে কালক্রমে শরীর বিশেষ কোন আহারীয় দ্রব্যের জন্য লালায়িত হয়না। তবে এমন পবিত্র ও পুষ্টিকর খাদ্য স্থির করিতে হইবে—যাহাতে স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে। আমার এই জিনিষটী না হইলে চলিবেনা, ঐ জিনিষটী না খাইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে—ইত্যাকার ধারণা বড়ই ভ্রমাত্মক, অধিকন্তু বিলাসলিপ্সাকে পরিহার করিয়া অনায়াসলব্ধ স্বচ্ছন্দ বনজাত শাক, ফল, মূল, কন্দ, প্রভৃতি নিরামিষ আহারে প্রবৃত্ত হইলে কামনার সংস্কার সাধিত হইয়া অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা লাভ ঘটিয়া থাকে।

খাদ্য সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে, কিছুকালের মধ্যে সেই খাদ্য অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। কিছুদিন মৎস্য, মাংসাদি খাদ্যদ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত থাকিলে দিন কতক বাদে আমাদের প্রবৃত্তি ঐ সকল খাদ্যকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিবে।

প্রবৃত্তিমার্গমূলক আমিষ আহারে রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধি হয়। শারীর ও মানস—বহুবিধ রোগেরই মূল কারণ রজঃ এবং তমোগুণাত্মক প্রবৃত্তিমার্গ। আমিষ আহার জনিত রজোমোহে আবৃত বুদ্ধি সম্পন্ন মানবগণই প্রবৃত্তিমার্গকে সন্মার্গ ভাবিয়া অর্থাৎ অসুখ সাধনকে সুখসাধন জ্ঞান করিয়া প্রবৃত্তি মার্গে প্রবৃত্ত হয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি, দক্ষতা, হিত সেবন, বাক্‌শুদ্ধি, শান্তি, ধৈর্য্য, প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি মোহতমসাবৃত সামান্য লোককে আশ্রয় করেনা।

আমিষ আহার সুপথ্য ও ধর্ম্মজনক ব্যবস্থা নয়। মহর্ষি চরক অপথ্য ও অধর্ম্মকেই যাবতীয় রোগোৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ উন্মাদ চিকিৎসিত নামক অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

"নিবৃত্তামিষ মদ্যো যো হিতাশী প্রযতঃ শুচিঃ
নিজাগন্তুভিরুন্মাদৈঃ সত্ত্ববান্ ন স যুজ্যতে"

যে ব্যক্তি মৎস্য, মাংস ও মদ্যবিরত হিত ভোজী, সংযতচিত্ত, ও পবিত্র, সেই সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তি নিজ বা আগন্তুজ কোন—প্রকার উন্মাদ রোগেই আক্রান্ত হয় না।

নিরামিষ সাত্ত্বিক ভোজনে মন নির্ম্মল হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এই শুদ্ধ সত্যবুদ্ধি দ্বারাই রজঃ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান ও পরম ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়। তজ্জন্যই পরমার্থ তত্ত্বলাভেচ্ছু মানবগণ কখনই আমিষ আহারে প্রবৃত্ত হন না।

আমিষও নিরামিষ ভোজী উভয়ের মধ্যে নিরামিষ ভোজিগণ সবল, সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

দুগ্ধ, ঘৃত, ফল, মূল, কন্দ প্রভৃতি সত্ত্বগুণ বর্দ্ধক নিরামিষ ভোজন দ্বারা রজঃ ও তমোগুণের অল্পতা সাধিত হইয়া সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, সুতরাং যুগপৎ আরোগ্য ও ইন্দ্রিয়বিজয় লাভ হইয়া থাকে। পুরাকালে ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ খাদ্যদ্রব্যের সহিত ধর্ম্ম সাধনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ উপলব্ধি করতঃ সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন করিতেন, তজ্জন্যই তাঁহারা সুদীর্ঘকাল সুস্থ শরীরে কঠোর তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর দেশে নিরামিষ ভোজনশীলা ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী বিধবা মহিলাগণও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকেন।

নিরামিষ সাত্ত্বিক ভোজন পুরুষকে সবলেন্দ্রিয়, বলবর্ণসুখোৎপন্ন ও দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করে। সুতরাং ঐহিক-পারলৌকিক শ্রেয়লাভার্থ নিরামিষ ভোজনই প্রশস্ত উপায়।

"স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপিপ্রপূর্য্যতে
অস্যদগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ"

স্বচ্ছন্দবনজাত শাক দ্বারাই যখন উদর পূরণ হইতে পারে, তখন এই দগ্ধোদরের নিমিত্ত কে মহাপাতক করিবে? প্রকৃতিদত্তও উদ্ভিদ্ ভাণ্ডারে মানবের শরীর পোষণোপযোগী স্বাস্থ্যজনক উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য সমূহ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। সুতরাং রজঃ ও তমোগুণবর্দ্ধক আমিষাহার বর্জ্জন করিয়া ফল, মূল, কন্দ, শাক প্রভৃতি উদ্ভিদ্ দ্রব্যই আহার্য্য রূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

মৎস্যমাংসাদি অপবিত্র খাদ্য-শরীর পোষণ পক্ষে কখনই হিতকর নয়, বরং পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। মানব শরীরে যেরূপ নানাপ্রকার পীড়া হয়, পশু, পক্ষী, মৎস্যাদিরও সেইরূপ নানাবিধ পীড়া দেখা যায়। অনেক সময়ে ইহাদের শরীরের বাহিরে ভাগ দেখিতে ভাল দেখায় বটে, কিন্তু অনেকেরই ভিতরে পীড়া বর্ত্তমান।

মানব শরীরের ন্যায় এই সকল প্রাণীর ভিতরের অবস্থা অনেক সময়ে জানা যায় না। এই সকল পীড়িত পশুর মাংস ও মৎস্যাদি খাইয়া সহজেই শরীর রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তদ্ব্যতীত পশু ও মৎস্যাদির শরীরে নানাবিধ রোগোৎপাদক কীটাণু বাস করে। এই কীটাণুগুলির ও মানব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া জন্মাইয়া থাকে। কর্কট, কচ্ছপ, মৎস্যাদি জলচর জীব সকল কিপ্রকার খাদ্য ভক্ষণ করে তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ,

প্রভৃতি নানাবিধ সংক্রামক রোগাক্রান্ত মানবের মৃতদেহ নদী-তরঙ্গে ভাসিয়া যায়। ঐ সকল শবের গলিত মাংস—মৎস্যাদি জলচর জীব সকল আনন্দে ভক্ষণ করে। শবভক্ষণকারী মৎস্যকে অপর মৎস্য খাইয়া থাকে, এইরূপে প্রায় সকল মৎস্যের ভিতরেই রোগোৎপাদক কীটাণু প্রবেশলাভ করে। অতএব সকল মৎস্য দ্বারাই রোগাক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে চিকিৎসকগণ মৎস্য মাংস খাইতে নিষেধ করেন। বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ প্রভৃতি রক্তদুষ্টি পীড়ায়ও চিকিৎসকগণ মৎস্য মাংসাদির পরিবর্ত্তে নিরামিষাহারের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং আমিষভোজন মানবের পক্ষে যে উৎকৃষ্ট খাদ্য—এতদ্বারাও তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও আমিষ আহারের অনিষ্টকারিতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শ্যেণ, কাক, চিল, শকুন, বাজ, হাড়গিলা, প্রভৃতি মৎস্য-মাংসপ্রিয় পক্ষিগণ মৃতজীবদেহ বা অন্য কোন প্রাণী বধ করিয়া আহার করে। ইহাদের কণ্ঠস্বর কর্কশ, স্বভাব নিষ্ঠুর, কেহই ইহাদিগকে আদর করিয়া লালন পালন করেনা। কিন্তু শস্যভোজী শুক, পারাবত, ঘুঘু, টিয়া, ময়না, কোকিল প্রভৃতি পাখিগণ নিরীহ, শান্তস্বভাব, দর্শনপ্রিয়, ইহাদের স্বরও মধুর, ইহারা কাহারও অনিষ্ট করেনা। অধিকন্তু প্রত্যুষে বৃক্ষশাখায় বসিয়া সুমধুররবে ভগবানের অপার মহিমা কীর্ত্তন করতঃ প্রেমিক জনের আনন্দবর্দ্ধন করে। এই জন্যই অনেকেই ইহাদিগকে গৃহে রাখিয়া সাদরে লালন পালন করিয়া থাকে। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শৃগাল প্রভৃতি মাংসাশীপশু সকল হিংস্র জন্তু মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ, ইহার সর্ব্বদা কোপন স্বভাব, নিষ্ঠুর, ও আতঙ্কজনক, ইহাদিগকে দেখিলেই সভয়ে দূরে পলাইতে হয়। অপরদিকে গরু, ছাগল, মেষ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি উদ্ভিদভোজী পশু সকল নিরীহ ও শান্ত স্বভাব, ইহারা কাহারও অনিষ্ট করেনা। যাহারা মনে করেন নিরামিষ ভোজনে শরীর দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হয়, শরীরের অপচয় ঘটিতে পারে, তাহারা একবার উদ্ভিদভোজী বৃহৎকায় হস্তীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন। উদ্ভিদ্‌ভোজী হইয়াও হস্তীর দেহ অতিবৃহৎ ও দৃঢ়, ইহারা অতিশয় বলবান ও কষ্টসহিষ্ণু। হস্তীর ন্যায় উষ্ট্রও বৃহৎকায়, প্রাণীজগতে উষ্ট্রের ন্যায় সহিষ্ণু আর কেহই নয়। এই সকল উদ্ভিদভোজী পশুদের দ্বারা মানব সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে। খাদ্যই যে জীবদেহের বর্ণ, গঠন, ও চরিত্র পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ, তাহা এই সকল পশুপক্ষিগণের মধ্যে আহারের বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বভাবের বিভিন্নতা দেখিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা বলাই বাহুল্য যে, খাদ্যের দোষগুণ ভেদে মানবেরও আকৃতি, প্রকৃতি, গঠিত হইয়া থাকে

লঙ্কাধিপতি রাবণ কৃত

নাড়ী পরীক্ষা।

(কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ)

অগণিত মহিমায়ৈ সাধকানন্দদায়ৈ
সকল বিভব সিদ্ধ্যৈ দুর্গতিধ্বান্ত হন্ত্র্যৈ।
অমৃতজলধিজায়ৈ জাতরূপাত্মমূর্ত্ত্যৈ
মধুরিপুবনিতায়ৈ চেন্দিরায়ৈ নমোঽস্তু ॥ ১ ॥
গদাক্রান্তস্য দেহস্য স্থানান্যষ্টৌ পরীক্ষয়েৎ
নাড়ীং মূত্রং মলং জিহ্বাং শব্দস্পর্শদৃগাকৃতিম্ ॥২॥
রুগ্নস্য মুগ্ধস্য বিমোহিতস্য
দীপঃপদার্থানিব জীবনাড়ী।
প্রদর্শয়েদ্দোষজনিস্বরূপম্
ব্যস্তং সমস্তং যুগলীকৃতংচ ॥ ৩ ॥

যাঁহার মহিমা অগণিত, যিনি সাধকদিগকে আনন্দ দান করেন, যাঁহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিভবসিদ্ধি হয়, যিনি দুঃখ-দারিদ্র্য-রূপ অন্ধকার রাশি হরণ করেন, সেই অমৃত জলধিতনয়া স্বর্ণময়ী মধুরিপু বনিতা ইন্দিরাকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আটটীস্থান পরীক্ষা করিবে। যথা নাড়ী, মূত্র, মল, জিহ্বা, স্বর স্পর্শ, চক্ষুঃ ও আকৃতি ॥ ২ ॥

প্রদীপ যেমন অন্ধকার রাশি দূর করিয়া পদার্থ সমূহকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ জীব-নাড়ীই মুগ্ধ ও বিমোহিত রুগ্নব্যক্তির দেহস্থ বায়ুপিত্ত ও কফাত্মিকা প্রকৃতির স্বরূপ এবং তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা, দোষ দ্বয়ের অবস্থা ও দোষ ত্রয়ের মিলনে সঞ্জাত অবস্থাকে প্রকাশ করে ॥ ৩ ॥

অস্তি প্রকোষ্ঠবা নাড়ী মধ্যে কাপি সমাশ্রিতা
জীবনাড়ীতি সা প্রোক্তা নন্দিনা তত্ত্ববেদিনা ॥৪
অঙ্গুষ্ঠ মূলসংস্থাতু বিশেষণ পরীক্ষ্যতে।
সাহি সর্ব্বাঙ্গগা নাড়ী পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ সুভাষিতা ॥৫॥
একাঙ্গুলং পরিত্যজ্যাধস্তাদঙ্গুষ্ঠমূলতঃ।
পরীক্ষেদযত্নবান্ বৈ সা হ্যভ্যাসাদেব লক্ষ্যতে ॥৬॥
অঙ্গুষ্ঠমূল ভাগে যা ধমনী জীবসাক্ষিণী।
তচ্চেষ্টয়া সুখং দুঃখং জ্ঞেয়ং কায়স্য
পণ্ডিতৈঃ ॥ ৭ ॥

মনিবন্ধের নিম্ন হইতে কনুই পর্য্যন্ত হস্তের অংশ বিশেষকে প্রকোষ্ঠ কহে। তত্ত্বদর্শী নন্দি বলিয়াছেন ঐ প্রকোষ্ঠমধ্যে একটী নাড়ী আছে তাহার নাম জীবনাড়ী ॥ ৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—জীব-নাড়ী সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছে। তন্মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ-মূলে (মণিবন্ধ সন্ধির নীচেই) যে জীবনাড়ী আছে, তাহারই পরীক্ষা করা হইয়া থাকে ॥৫॥

অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে (মনিবন্ধ সন্ধির নীচে) এক অঙ্গুলি পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক নাড়ী পরীক্ষা করিবে। (নাড়ী টিপি-লেই অন্তরের অবস্থা জানিতে পারা যায় না সেজন্য অভ্যাস আবশ্যক) অভ্যাসের দ্বারাই জীবনাড়ীর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায় ॥৬॥

অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যে জীবসাক্ষিনী ধমনী

স্ত্রীণাঃ ভিষগ্বামহস্তে বাম পাদেচ যত্নতঃ।
পুংসাং দক্ষিণ ভাগেচ নাড়ীং বিদ্যাৎ বিশেষতঃ ॥৮॥
গুল্ফস্যাধোঽঙ্গুষ্ঠভাগে পাদে ত্বঙ্গুষ্ঠমূলতঃ।
একাঙ্গুলং পরিত্যজ্য মনিবন্ধে পরীক্ষয়েৎ।
অধঃকরেণ নিষ্পীড্য ত্রিভিরঙ্গুলিভির্মুহুঃ ॥ ৯ ॥
লঘু বামেন হস্তেন চালস্যাতুর কূর্পরম্।
স্ফুরণং নাড়িকায়াস্তু শাস্ত্রেণানুভবৈর্নিজৈঃ
সম্প্রদায়েন বা যত্নাৎ পরীক্ষেত ভিষক্তমঃ ॥১০॥

আছে, সেই ধমনীর চেষ্টা অর্থাৎ গতিবিশেষ দ্বারা সুপণ্ডিত চিকিৎসকগণ দেহের সুখ দুঃখ সকল অবগত হইবেন ॥৭॥

চিকিৎসক যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের বামহস্তে ও বামপদে এবং পুরুষদের দক্ষিণভাগে অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তে ও দক্ষিণ পদে বিশেষ করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিবেন ॥৮॥

পাদে যে ভাগে অঙ্গুষ্ঠ আছে সেই দিকে অঙ্গুষ্ঠের মূল দেশে যে গুলফ সন্ধি আছে, সেই গুলফের নীচে একাঙ্গুল পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিবে এবং হস্তেও তদ্রূপ। মনিবন্ধের নীচে একাঙ্গুল পরিমিত স্থান ত্যাগ করিয়া হস্তের তিনটী অঙ্গুলীদ্বার নাড়ীটি টিপিয়া পরীক্ষা করিবে। (একবার নাড়ী টিপিলেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায় না সেজন্য নাড়ীটী দুই চারিবার টিপিয়া দেখা আবশ্যক) ॥৯॥

নাড়ী দেখিবার সময় সুনিপুণ চিকিৎসক অতি যত্নের সহিত বামহাত দিয়া রোগীর কনুই ধীরভাবে ধরিয়া (দক্ষিণ হাতের তিনটী অঙ্গুলী দ্বারা) নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিবে। নাড়ী পরীক্ষা কালে শাস্ত্রজ্ঞান স্বকীয় অনুভব ও সম্প্রদায়গত উপদেশ সকল মনে রাখিতে হইবে

আদৌ বাতবহা নাড়ী মধ্যে বহতি পিত্তলা।
অন্তে শ্লেষ্মাবিকারেণ নাড়িকেতি ত্রিধামতা ॥১১॥
বাতাধিক্যে ভবেন্নাড়ী প্রব্যক্তা তর্জ্জনীতলে।
পিত্তে ব্যক্তা মধ্যমায়াং তৃতীয়াঙ্গুলিকা কফে॥১২॥
তর্জ্জনী-মধ্যমা মধ্যে বাতপিত্তেঽধিকে স্ফুটা।
অনামিকায়াং তর্জ্জন্যাং ব্যক্তা বাতকফে ভবেৎ ॥
মধ্যমানামিকা মধ্যে স্ফুটা পিত্তকফে ভবেৎ ॥
অঙ্গুলিত্রিতয়েঽপি স্যাৎ প্রব্যক্তা সন্নিপাততঃ ॥
॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

(নতুবা নাড়ীর গতি দ্বারা রোগীর প্রকৃত অবস্থা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেনা।) ॥১০॥

আদিতে বাতবহা নাড়ী, মধ্যে পিত্তবহা নাড়ী এবং অন্তে শ্লেষ্ম বিকারের দ্বারা শ্লেষ্ম বহা নাড়ী—এই তিন প্রকার নাড়ী শাস্ত্রে কথিত আছে ॥১১॥

(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তিনটী অঙ্গুলীদ্বারা নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়)—বায়ুর আধিক্য হইলে নাড়ীর গতি (চিকিৎসকের) তর্জ্জনী অঙ্গুলীর নীচে বিশেষ করিয়া আইস্ত হইতে থাকে, পিত্তের আধিক্য হইলে মধ্যমা অঙ্গুলী তলে এবং কফের আধিক্য হইলে নাড়ীর গতি অনামিকা অঙ্গুলীর তলে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয় ॥১২॥

বায়ু ও পিত্তের আধিক্য হইলে নাড়ীর গতি তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিতে পরিস্ফুট হয়। বায়ু ও কফের আধিক্য হইলে নাড়ীর গতি তর্জ্জনী ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয়ে পরিস্ফুট হয়। পিত্ত ও কফের আধিক্য হইলে নাড়ীর গতি মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয়ে অধিকস্ফুরূপে অনুভূত হইতে থাকে। এবং সন্নিপাত অর্থাৎ

বাতে বক্রগতির্নাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী।
স্থিরা শ্লেষ্মবতী প্রোক্তা সর্ব্বলিঙ্গাচ সর্ব্বগা।
শ্লেষ্মণা স্তিমিতা স্তব্ধা মিশ্রাংমিশ্রৈস্তু লক্ষয়েৎ॥১৫
বাতোদ্রেকে গতিং কার্য্যাৎ জলৌকাসর্পয়োরিব।
পিত্তোদ্রেকেতু সা নাড়ী কাকমণ্ডুকয়োর্গতিম্
॥ ১৬ ॥
হংসস্যৈব কফোদ্রেকে গতিং পারাবতস্য বা।
নাড়ী ধত্তে ত্রিদোষেতু গতিং তিত্তিরলাবয়োঃ ॥১৭
কদাচিন্মন্দগমনা কদাচিদ্বেগবাহিনী।
দোষ দ্বয়োদ্ভবো রোগো বিজ্ঞেয়ঃস ভিষগ্বরৈঃ ॥১৮
কচিন্মান্দ্যাং কচিত্তীব্রাং ত্রুটিতাংবহতে কচিৎ।
কচিৎসূক্ষ্মাং কচিৎ স্থূলাং নাড্যসাধ্যগদে গতিম্
॥ ১৯ ॥

তিনটী দোষেরই আধিক্য হইলে নাড়ীর গতি তিনটী অঙ্গুলির নীচেই প্রবলভাবে অনুভূত হইতে থাকে ॥১৩॥১৪॥

বায়ুতে নাড়ীর গতি বক্র, পিত্তে চঞ্চল, কফে মন্থর স্তিমিত ও স্তব্ধ, দোষদ্বয়ে, মিশ্র-লক্ষণ এবং ত্রিদোষে উক্ত তিনটী লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥১৫॥

বাতাধিক্য নাড়ীর গতি জলৌকা ও সর্পের গতির ন্যায়, পিত্তাধিক্যে কফ ও মণ্ডুকের গতির ন্যায়, কফাধিক্যে হংস ও পারাবতের গতির ন্যায় এবং ত্রিদোষের আধিক্যে তিত্তির ও লাব পক্ষীর গতির ন্যায় নাড়ীর গতি হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

নাড়ীর গতি কখন মন্দ এবং কদাচিৎ বেগবতী হইলে দুইটি দোষের প্রকোপ জন্য রোগ হইয়াছে বলিয়া জানিবে ॥১৮॥

নাড়ীর গতি কখন মন্দ, কখন তীব্র, কখন কখন ছিন্ন (অর্থাৎ দুই একটা স্পন্দন বাদ-

স্বস্থানং চ্যবতে নাড়ী প্রবহেদতিচঞ্চলা।
অসাধ্যলক্ষণা প্রোক্তা পিচ্ছিলা চাতি চঞ্চলা ॥২০
অঙ্গুষ্ঠাদূর্দ্ধসংলগ্না সমাচ বহতে যদি।
নির্দ্দোষা সা চ বিজ্ঞেয়া নাড়ী লক্ষণ কোবিদৈঃ
॥ ২১॥
স্থিত্বা স্থিত্বা গতিংযাতি সা নাড়ী মৃত্যুদায়িনী।
অতিশীতা চ যা নাড়ী সা জ্ঞেয়া প্রাণহারিণী ॥২২
উষ্ণা বেগবতী নাড়ী জ্বরকোপে প্রজায়তে।
উদ্বেগ ক্রোধকামেষু, ভয় চিন্তোদয়ে তথা ॥
ভবেৎ ক্ষীণ গতির্নাড়ী জ্ঞাতব্যা বৈদ্যসত্তমৈঃ ॥
ক্ষীণ ধাতোশ্চ মন্দাগ্নে র্ভবেন্মন্দতরা ধ্রুবম্
॥ ২৩॥২৪॥

দিয়া) কখন সূক্ষ্ম ও কখন স্থূল হইলে রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে ॥১৯॥

নাড়ীর গতি অতি চঞ্চল হইয়া যদি ত্বকের উপরে স্পন্দিত হইতেছে দেখা যায় অথবা নাড়ীর গতি অতি চঞ্চল ও পিচ্ছিল (অর্থাৎ অতি কষ্টে একবার অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়াই নিবৃত্ত) হয়) তবে উহা অসাধ্য লক্ষণ বলিয়া জানিবে ॥২০॥

নাড়ী যদি অঙ্গুষ্ঠের উর্দ্ধ হইতে সংলগ্ন হইয়া সমান ভাবে বহিতে থাকে (অর্থাৎ তিনটী অঙ্গুলিতেই সমান ও শান্ত গতিতে বহিতে থাকে তবে উহা নির্দোষ — নাড়ীবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥২১॥

থাকিয়া থাকিয়া যে নাড়ীর গতি হয়, সে নাড়ী মৃত্যুদায়িনী এবং যে নাড়ী অতি শীতল তাহাও প্রাণহারিণী বলিয়া জানিবে ॥২২॥

জ্বরকোপ, উদ্বেগ, ক্রোধ ও কামবেগে নাড়ীর গতি উষ্ণ ও বেগবতী হয় এবং ভয় ও চিন্তায় নাড়ীর গতি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

গুর্ব্বী সোষ্ণা চ রক্তেন পূর্ণা নাড়ী প্রজায়তে।
সামা গুর্ব্বী ভবেন্নাড়ী মন্দাসৃক্ পূর্ণিতাপি চ॥২৫
লঘ্বী বহতি দীপ্তাগ্নেস্তথা বেগবতী মতা।
সুখিনশ্চ ভবেন্নাড়ী স্থিরা বলবতী তথা॥ ২৬

অপিচ যাহার ধাতু সকল ক্ষীণ হইয়াছে ও অগ্নিমান্দ্য ঘটিয়াছে—তাহার নাড়ীর গতি মন্দ বলিয়া জানিবে। ॥২৩॥ ২৪॥

নাড়ী রক্তের দ্বারা পূর্ণ (রক্তাধিক্যে) হইলে নাড়ীর গতি উষ্ণ ও গুরু (পরিপূর্ণ) বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নাড়ী রক্তের দ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও যদি উহা আমযুক্ত হয়, তাহা-হইলে নাড়ীর গতি গুরু ও মন্দ হইয়া থাকে ॥ ২৫॥

যাহার অগ্নিবল অতি প্রবল—তাদৃশ দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী লঘু ও বেগবতী হয় এবং সুখী অর্থাৎ সুস্থব্যক্তির নাড়ী স্থিরা (সর্ব্বপ্রকার বিকৃতি শূন্য) ও বলবতী হয় ॥ ২৬॥

চপলা ক্ষুধিতস্য স্যাৎ স্থিরা তৃপ্তস্য সা ভবেৎ।
স্থিরা শ্লেষ্মবতী নাড়ী বহতিপ্রদরে তথা॥ ২৭॥
অজীর্ণেতু ভবেন্নাড়ী কঠিনা পূরিতা জড়া।
চপলা রসজা দীর্ঘা পিত্তে বেগবতীতথা॥ ২৮॥
প্রসন্না চ দ্রুতা শীঘ্রা ক্ষুদ্বির্ণাড়ী প্রবর্ত্ততে।
জ্বরে তীব্রা প্রসন্নাচ নাড়ী বহতি পিত্ততঃ॥ ২৯

ক্ষুধিত ব্যক্তির নাড়ী চঞ্চলা, তৃপ্ত অর্থাৎ ভুক্তব্যক্তির নাড়ী স্থির ও শ্লেষ্মবতী হয় এবং প্রদর রোগে ও নাড়ী স্থিরা ও শ্লেষ্মবতী হইয়া থাকে॥ ২৭

অজীর্ণরোগে নাড়ী কঠিনা, পূরিতা ও জড়তা সম্পন্ন হয়। রসজন্য নাড়ী চপলা ও দীর্ঘা হয় এবং পিত্তে নাড়ী বেগবতী হইয়া থাকে॥ ২৮॥

ক্ষুধিতব্যক্তির নাড়ী প্রসন্না, দ্রুতা ও শীঘ্র-গামিনী হয় এবং জ্বরে পিত্তাধিক্য হইলে নাড়ী প্রসন্না ও তীব্র হইয়া থাকে॥ ২৯॥

[ক্রমশঃ]

স্ফোটক

(কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্র নাথ কাব্যবিনোদ)

প্রদাহ হইতে উৎপন্ন পূয় রক্তাদি কোন পারীর গঠনে সীমা বদ্ধ হইয়া, থাকিলে ঐ স্থান উৎশেষ যুক্ত হয়, ইহারই নাম স্ফোটক। চলিত ভাষায় স্ফোটক কে ফোড়া বলে। Inflamation এর বঙ্গানুবাদে অনেকেই 'প্রদাহ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—বলা বাহুল্য আমিও সেই অর্থে 'প্রদাহ' শব্দের প্রয়োগ করিলাম।

শারীর তন্তু ধ্বংস হয় না, অথচ তাহাদের ক্রিয়া বিকার প্রাপ্ত হয়—এইরূপ কোন প্রকার আঘাত পাইলে—ঐ সকল তন্তুর বহুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে; এই ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনই—"প্রদাহ"। "প্রদাহ" সংজ্ঞাটী নিতান্ত আধুনিক। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার নাম—"ব্রণশোথ"। নব্য বৈজ্ঞানিকগণ অণুবীক্ষণের সাহায্যে—তন্তু সমূহের পরিবর্ত্তন (প্রদাহ) ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন—ধমনী শিখার সঙ্কোচন ও প্রসারণ, শিরা সমূহের বিকৃতি, রক্তের লোহিত কণার দ্রুত সঞ্চরণ, শ্বেত কণিকার মন্থর গতি, এবং শোণিতের জলীয়াংশের স্থিরতা—এইগুলি প্রদাহের বিশ্লেষণ। প্রদাহ যুক্ত স্থানের রক্ত বিকৃতি এবং রক্তবহা নাড়ীর ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। তাহারই ফলে—ঐ স্থান চেতনা বিহীন হইয়া পড়ে, উহার পোষকতা শক্তিও বিলুপ্ত হয়। কোন স্থান স্ফীত, উত্তপ্ত, বেদনাময়, লোহিতাভ কিম্বা অস্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট হওয়া—প্রদাহের অতি সাধারণ লক্ষণ।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ—প্রদাহ বা ব্রণ শোথকে ৬ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা:—

যে শোথের বর্ণ খুব লাল বা কাল, পীড়িত স্থান স্পর্শ করিলে থস্‌থসে বোধ হয়, টিপিলে টোল খায়,—তাহা বায়ুজনিত। অর্থাৎ বায়ু বিকৃত হইয়া ত্বক্ মাংস ও রক্তাদি আশ্রয় করিয়া এই প্রদাহ উপস্থিত করে। ইহাতে দপ্‌দপানি প্রভৃতি যন্ত্রণা কখনও বর্ত্তমান থাকে, কখনও বা থাকে না।

যে শোথ সত্বর পাকিয়া উঠে, পীড়িত স্থানের বর্ণ পীত বা লোহিত বর্ণ ধারণ করে, টিপিলে বসিয়া যায় না, অথচ নরম বোধ হয়, অত্যন্ত জ্বালা করে, তাহা পিত্ত বিকার হইতে উৎপন্ন।

যে শোথ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, বর্ণ পাণ্ডু বা শুক্ল হয় এবং চাকচিক্যযুক্ত, টিপিলে অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়, চুলকায়—তাহা কফজনিত।

যে শোথে পূর্ব্বোক্ত ৩ প্রকার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে,—তাহা ত্রিদোষজ।

দূষিত রক্ত হইতে রক্তজ শোথ জন্মে। ইহাতে পিত্তজ প্রদাহের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

মাকড়সা, ভীমরুল প্রভৃতির দংশনে, বিষাক্ত প্রাণীর মলমূত্রাদি সংযোগে, বিষাক্ত গাছের পাতা, আঠা প্রভৃতি লাগিলে, দূষিত জলের সংস্পর্শে, যে শোথ বা প্রদাহ উৎপন্ন হয়—তাহার নাম আগন্তুক।

আচার্য্যগণ—এ সকল কথা অতি বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন, আমি তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক "সুশ্রুত সংহিতা" পড়িবেন। পড়িয়া দেখিলে বুঝিবেন,—ইউরোপের জীবতত্ত্ববিজ্ঞানও ব্রণতত্ত্ব আবিষ্কারে সুশ্রুতের সমকক্ষ হইতে এখনও পারে নাই।

সাধারণতঃ স্ফোটক দুই প্রকার। (ক) তরুণ (Acute) (খ) পুরাতন (Chronic) এই তরুণ স্ফোটকের আরও দুইটী নাম আছে —"ফ্লেগ্‌মোনাস্" ও "হট্ অ্যাবসেস্"। বিলাতী বিজ্ঞানের মতে ষ্টাফিলোকক্কাস্ পাইয়োজিনিস্ অ্যাসবস্ নামক উদ্ভিজ্জাণু কর্ত্তৃক তরুণ স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্ফোটক একটী সৌত্রিক ঝিল্লীদ্বারা বেষ্টিত থাকে। ইহার নাম—আবরক ঝিল্লী

(Pyogenic membrane) পাইওজেনিক মেমব্রেণ। উৎপত্তি স্থান, প্রকৃতি এবং রোগীর শারীরিক অবস্থা ভেদে—স্ফোটকের নানাবিধ নামকরণ হইয়াছে। যথা—লিম্ফোটিক, মেটাষ্টাটিক, পাইমিক, ডিফিউজড, পিত্তর পারল, মাল্টিনোকিউনার—ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদেও অসংখ্য জাতীয় স্ফোটকের নাম পাওয়া যায়। পরে তাহার আলোচনা করিব।

ইলিয়াক যাসা প্রভৃতি স্থানে লিম্পোটিক স্ফোটকের উদ্ভব হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিদেরই এইরূপ ফোড়া হয়। রোগী—ইহার পূর্ব্ব লক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারে না, আক্রান্ত স্থান সহসা ফুলিয়া উঠে, বেদনার আতিশয্য অনুভূত হয় না, সঞ্চালন বুঝা যায়, এই জাতীয় স্ফোটক হইতে সচরাচর বিশুদ্ধ পূয বাহির হইয়া থাকে।

মেটাষ্টাটিক (Metustutic) স্ফোটক। প্রথম উদ্ভবের স্থান ত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে প্রকাশ পাইলে—তাহার নাম মেটাষ্টাটিক।

পাইমিক স্ফোটক। এক রকম দূষিত (Infective) জ্বর আছে—যাহাতে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে —তাহার নাম—পাইমিয়া (Pyamic)। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে শরীরে বহুসংখ্যক স্ফোটক বহির্গত হইয়া থাকে। এই স্ফোটকের নামই পাইমিক অ্যাবসেস। পাইমিয়া জ্বরের প্রধান লক্ষণই—এই স্ফোটকসমূহ। পাইমিক স্ফোটক দুই প্রকার, প্রাথমিক ও দ্বৈবারিক। সংযমিত রক্তের ঘন খণ্ড (এম্বোলাই) কোন রক্ত বহা নালীর মধ্যে আবদ্ধ হইলে তদুপরি থ্রম্বোসিস্ (হার্ট বা আর্টারির স্থানিক সংযত রক্ত) উৎপন্ন হইয়া থাকে।' এই থ্রম্বোসিসের ভিতর উদ্ভিজ্জাণু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ব্লাড ভেসেলসের মধ্য দিয়া, ইহাই সন্নিহিত তন্তু ও বিধান মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া তথায় প্রদাহ উৎপন্ন করে। এই প্রদাহ শীঘ্রই স্ফোটকে পরিণত হয়। ইহারই নাম পাইমিক স্ফোটক।

সিষ্টেমিক সারকুলেশন হইতে যে সমস্ত এম্বেলিজম্ বিচ্যুত হয়, তাহারা প্রথমে ফুসফুসে উপস্থিত হইয়া আটকাইয়া যায় এবং তথায় স্ফোটক উৎপন্ন করে। এই সকল স্ফোটকের পূয ও দূষ্য পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শীঘ্রই শরীরের অন্যান্য যন্ত্রে স্ফোটকাকারে প্রকাশ পায়। ইহাকেই দ্বৈবারিক স্ফোটক বলে। যকৃৎ, প্লীহা বৃক, মস্তিষ্ক এবং সন্ধিস্থান—দ্বৈবারিক স্ফোটকের উৎপত্তি স্থান।

ডিফিউজড স্ফোটক সচরাচর ইলিয়াক্ ফসায়; কদাচিৎ বা সন্ধিস্থানে আবির্ভূত হয়। ইহার পাইয়োজেনিক মেম্ব্রেন থাকেনা—সুতরাং এই স্ফোটক গঠন সমূহ মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আক্রান্ত স্থান ধ্বংস করিয়া ফেলে।

পিত্তর পারল স্ফোটক—

প্রসবান্তে স্ত্রীলোকের দেহেই উদ্ভূত হয়। ইহার বাঙ্গালা নাম "প্রসবোত্তরীয়।

কতকগুলি স্ফোটক নালীদ্বারা সংযুক্ত হইলে—তাহাকে Malti Laculor absess বলে।

যে স্ফোটকের অভ্যন্তরে পূয ও বায়ু—দুই বর্ত্তমান থাকে—তাহার নাম Tympanetic or Emphysematic absess.—উদর গহ্বর প্রাচীর এই জাতীয় স্ফোটকের

উৎপত্তি স্থান। কখন কখন ইহা অস্থি পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়।

মৃত অস্থি এবং রুদ্ধ মূত্রের উত্তেজনায় অনেক সময় স্ফোটক উৎপন্ন হইতে পারে। এই স্ফোটকে প্রদাহের লক্ষণ ত থাকেই অধিকন্তু আক্রান্ত স্থান ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে। ত্বকের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, চিক্কণ ও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়, টিপিলে কোমল বোধ হয়, কিন্তু চারিপার্শ্ব কঠিন থাকে। দপ্ দপ করে, জ্বালা করে। রোগীর কখনও বেশী কখনও বা অল্প জ্বর হইতে থাকে। স্ফোটক সম্পূর্ণ না পাকা পর্য্যন্ত জ্বরের লক্ষণ তিরোহিত হয় না।

পুরাতন স্ফোটক (chronic or cold abscess)। প্রথম উদ্ভবের সময় সকল রোগই "নূতন", কালান্তরে সেই "নূতন" পুরাতন হইয়া দাঁড়ায় ইহাই সাধারণ নিয়ম। স্ফোটক সম্বন্ধে কিন্তু এ নিয়ম একেবারেই খাটে না। স্ফোটক কিছুদিন বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে "পুরাতন" আখ্যা দেওয়া চলেনা। ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। নূতন স্ফোটকে —যেমন টাটানি, দপ দপানি প্রভৃতি উপসর্গ থাকে, স্ফোটক মুখে (Point) ঔজ্জ্বল্য চিক্কণতা প্রত্যক্ষ করা যায়, পুরাতন স্ফোটকে ইহার কোন লক্ষণ কোন পাওয়া যায় না। কেবল— স্ফীততা, কোমলতা এবং সঞ্চালনতা বুঝা মাত্র। পুরাতন স্ফোটক কখনও অর্ব্বুদের মত (আব) আকার ধারণ করে— কঠিন, মোটেই ফ্লাকচুয়েসন পাওয়া যায় না। স্থিতি কাল—২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে। তরুণ স্ফোটকের মত ইহাতে প্রাদাহিক জ্বর দেখা দেয় না, কদাচ কখনও কোন কোন রোগীর একটু জ্বর ভাব অনুমিত হয়। রোগী পীড়িত স্থানকে ভয়াক্রান্ত মনে করে, টিপিলেও তেমন ব্যথা বোধ হয় না।

এই শ্রেণীর স্ফোটক নির্ণয় করিতে গিয়া— অনেক চিকিৎসককেই ভ্রান্ত হইতে হয়। অনেক সময় ফ্যাটি টিউমার বলিয়া ভ্রম জন্মে।

ফ্যাটীটিউমার সাধারণতঃ গোলাকার। উহা মসৃণ, স্থিতিস্থাপক, স্পর্শ করিলে—কিছু কোমল বলিয়া বোধ হয়, বেদনা থাকে না, কখনও বা ভিতরে তরল পদার্থের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতাকার ধারণ করে। কখনও বা আকারের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেও দেখা যায়। কখনও বা উৎপত্তিস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অর্ব্বুদের গুরুত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ— ঐ পরিবর্ত্তনের হেতু। ফ্যাটীটিউমারেও কখন কখন পুয জন্মিতে পারে। এই পূযোৎপত্তি বুঝিবার জন্য সূক্ষ্মদর্শন শক্তি থাকা চাই। এ সম্বন্ধে মহাত্মা সুশ্রুত বড় পাকা কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি— "অপক্ক অবস্থায় শোথ, অল্প উষ্ণ, শরীরের চর্ম্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দৃঢ় অল্প শোথ ও বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। পাকিতে আরম্ভ হইলে—বিদ্ধবৎ পিপীলিকা দংশনবৎ, শস্ত্রদ্বারা ছেদন বৎ, দণ্ডদ্বারা তাড়নাবৎ, ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধবৎ—যন্ত্রণা বোধ হয়। বৃশ্চিক দষ্ট স্থানে যেরূপ উষ্ণতা ও জ্বালা বোধ হয়, ব্রণ পক্ক হইতে থাকিলে তদ্রূপ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। শয়ন উপবেশন প্রভৃতি কোন কার্য্যেই রোগীর শান্তি থাকে না। এই সময় আক্রান্ত স্থান উচ্চ হইয়া উঠে, পরিসর বৃদ্ধি পায়, উপার-

ভাগের ত্বক বিবর্ণ ধারণ করে। জ্বর, পিপাসা, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইলে—সকল যন্ত্রণা তিরোহিত হয়। উহা পাণ্ডুবর্ণ ও বলির ন্যায় আকার বিশিষ্ট হয়, স্ফীততার কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। অঙ্গুলীর চাপ দিলে নত হয়, ত্বক্ চিক্কণ হয়, জল সঞ্চয়ের ন্যায় পূয সঞ্চরণ করে, মধ্যে মধ্যে টন্ টন্ করে এবং চুলকায়। কফ জন্য এবং আঘাত জন্য শোথ হইলে, পক্কাবস্থায়ও এ সকল লক্ষণ জন্মে না। সুতরাং এই দুই স্থলে পক্ককে অপক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এইরূপ সন্দিগ্ধ স্থলে—শোথ স্থান শীতল, স্থূল, শরীরের চর্ম্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে, চতুর্দ্দিক সঙ্কুচিত হইয়া একস্থানে প্রস্তর খণ্ডবৎ ঘন হইলে, পক্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে, ইহাতে ভ্রম জন্মিবার ভয় নাই।"

যে চিকিৎসক পক্কাপক্ক ব্রণ নির্ণয়ে তৎপর, তিনিই বাস্তবিক চিকিৎসক। তদ্ভিন্ন অন্যেরা তস্কর। সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"আমং বিপচ্যমানঞ্চ সম্যক পক্কঞ্চ যো

ভিষক।

সানীয়াৎ স ভবেৎ বৈদ্য শেষা তস্কর বৃত্তয়ঃ॥

স্ফোটকের স্থান—দেহের সর্ব্বাংশেই স্ফোটক জন্মিতে পারে। যে যে স্থানে এরিওলার টিসু ও অ্যাডিসরভেণ্ট গ্ল্যাণ্ড অধিক পরিমাণে বিদ্যমান, সেই স্থানেই সচরাচর স্ফোটক উদ্ভূত হইয়া থাকে।

আকৃতি।—গোলাকার গুবাক হইতে নারিকেলের চেয়েও বৃহৎ—স্ফোটকের আকার হইতে পারে।

[ক্রমশঃ]

কায়চিকিৎসা-ক্রমোপদেশ

বা

Practice of Medicine.

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

গ্রহণী রোগ।

গ্রহণী নাড়ী অর্থাৎ পাকাশয় দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম গ্রহণী রোগ। অতিসার রোগ আরোগ্য হওয়ার পরে অগ্নির প্রদীপ্তি হইতে না হইতেই কুপথ্য সেবনে জঠরাগ্নি দুর্ব্বল হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দূষিত করার ফলে অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া গ্রহণী নাড়ীকে অধিকতর দূষিত করার জন্য এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অগ্নিদ্বারা গ্রহণীর বল বৃদ্ধি হয়, এজন্য অগ্নিকে গ্রহণী বলা যায় এবং অগ্নি দূষিত

হইলে গ্রহণী নাড়ীও দূষিত হইয়া থাকে, এজন্য গ্রহণী রোগে অগ্নির বিরোধী ক্রিয়া পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

উপরে যে আমরা অতিসার আরোগ্যের পর কুপথ্যের জন্য গ্রহণী রোগ উৎপন্নের কথা বলিয়াছি, অনেক সময় অন্যকারণে সেরূপ না হইয়াও এই রোগ উৎপন্ন হয়। যাহাহউক অপক্ক আহারীয় রস দ্বারা শরীর ব্যাপ্ত হইলে গ্রহণী রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গ্রহণী রোগেও লঙ্ঘন পাচন এবং বিরেচন দ্বারা আমাশয় বিশুদ্ধ করিয়া পঞ্চকোল দ্বারা প্রস্তুত পেয়াদি লঘু আহার এবং অগ্নযুদ্দী-পক ঔষধ সকলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শুঁঠ, মুথা, আতইচ ও গুলঞ্চ প্রত্যেক দ্রব্য ।০ আনা, জল ৴৷৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া —এই ক্বাথ অথবা ধনে, আতইচ, বালা, যমানী, মুথা, শুঁঠ, বেড়েলা, শালপানি চাকুলে ও বেলশুঁঠ—সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল ৴৷৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, ইহাদিগের ক্বাথ গ্রহণী রোগের প্রথমাবস্থায় পান করাইলে আম দোষের পরিপাক হইয়া অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

গ্রহণী রোগের প্রথমাবস্থায় অতীসার চিকিৎসায় যে চিত্রকাদিগুড়ির কথা বলা হইয়াছে, তাহা সেবন অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। ইহা আমপাচক ও অগ্নির উদ্দীপক। প্রাতে ও বৈকালে ২বার করিয়া শীতল জল অনুপানে ঐ ঔষধের ব্যবস্থা করা ভাল।

বাতজগ্রহণী রোগে উদরাধ্মান ও শূল বং বেদনা থাকিলে শালপর্ণাদি কষায় নামক পাচনটি চিত্রকাদি গুড়ি ভিন্ন সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহার উপাদান গুলি—

শালপর্ণী বলা বিল্বধান্য শুণ্ঠীকৃতঃ শৃতঃ।

শালপানি, বেড়েলা বেলশুঁঠ, ধনে ও শুঁঠ। প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ আনা, জল ৴৷৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া।

পৈত্তিক গ্রহণী রোগে গুহ্য শূল ও অন্যান্য উপদ্রব নিবৃত্তির জন্য তিক্তাদি কষায়টী ব্যবস্থা করিবে ইহার উপাদান।

তিক্তা মহৌষধ রসাঞ্জন ধাতকী ভিঃ
পথ্যেন্দ্রবীজ ঘন কৌটজভঙ্গুরাভিঃ।

কট্‌কী, শুঁঠ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, হরীতকী ইন্দ্রযব, মুথা, কুড়চির ছাল ও আতইচ—মিলিত ২ তোলা, জল ৴৷৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া।

কফজ গ্রহণী রোগে কোষ্ঠদেশে শূল জন্মাইলে কলিঙ্গাদি চূর্ণের ব্যবস্থা হিতকর। ইহার উপাদান—

কলিঙ্গী হিঙ্গু তিবিষা বচা সৌবর্চ্চলাভয়াঃ।

ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, আতইচ, বচ, সৌবর্চ্চল লবণ ও হরীতকী,—ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেব্য।

গ্রহণী রোগে পাচন, বমন বা বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ করার পর অগ্নির উদ্দীপক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চিত্রকাদি গুড়িকা অগ্নি-উদ্দীপক ঔষধ। জ্বরে যে অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত রামবান প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে, সেই রামবানও গ্রহণী রোগের প্রথমাবস্থার মহৌষধ। রামবানের উপাদান গুলির পরিচয় অগ্নিমান্দ্য অধিকারে প্রদত্ত হইবে। তণ্ডুলজল অনুপানে একবার করিয়া রামবান ও একবার করিয়া চিত্রকাদিগুড়ি এবং মধ্যাহ্নে একবার করিয়া অগ্নিমান্দ্য অধিকা-

রোক্ত ভাস্করলবণ অথবা আবশ্যক বিবেচনায় ভাস্করলবণ এক আনা ও বজ্রক্ষার একআনা একত্র মিশাইয়া শীতল জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থায় বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

নাগরাদ্যচূর্ণ ও পাঠাদ্যচূর্ণ নামক ঔষধ দুইটীর মধ্যেও যে কোনটী প্রস্তুত করিয়া উপরিলিখিত তিনটী ঔষধের মধ্যে একটী কমাইয়া ব্যবহার করান যাইতে পারে। ঐ দুইটী ঔষধের উপাদান নিম্নে লেখা যাইতেছে

নাগরাদ্য চূর্ণম্।

নাগরাতিবিষা মুস্তং ধাতকীচ রসাঞ্জনম্।
বৎসকত্বক ফলং পাঠা বিল্বং কটুকরোহিণী॥

শুঁঠ, আতইচ, মুথা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চিমূলের ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেল শুঁঠ ও কটকি—ইহাদের চূর্ণ সমভাগ। অনুপাম আতপ চাউল ধোওয়া জল। মাত্রা দুই আনা। গ্রহণী রোগে রক্তদোষ থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এই ঔষধের উপাদানগুলির পরিচয় নিম্নে লেখা যাইতেছে—

শুঁঠ—পাচক, আগ্নেয়। আতইচ—পাচক অতীসার নাশক। মুথা—গ্রাহী। ধাইফুল—অতীসার নাশক। রসাঞ্জন—রক্তরোধক। কুড়চিরছাল—সংগ্রাহী। ইন্দ্রযব—অতীসার নাশক। আকনাদি—অতীসার নাশক। বেলশুঁঠ—গ্রহণী রোগ নাশক। কটকী—অগ্ন্যদ্দীপক।

পাঠাদ্যচূর্ণম্।

পাঠাবিল্বানল,ব্যোষ জম্বু দাড়িম ধাতকী।
কটুকাতিবিষা মুস্তা দার্ব্বী ভূনিম্ববৎসকৈঃ॥
সর্ব্বৈরেভিঃ সমং চূর্ণং কৌটজং তণ্ডুলাম্বুনা।

আকনাদি, বেলশুঁঠ, চিতামূল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, জামছাল, দাড়িম ফল, ধাইফুল, কটকী, আতইচ, মুথা, দারুহরিদ্রা, চিরতা ও ইন্দ্রযব। প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের সমান কুড়চির মূলের ছাল চূর্ণ। তণ্ডুল জলের সহিত সেব্য। মাত্রা একআনা হইতে দুই আনা।

আকনাদি—সংগ্রাহী। বেলশুঁঠ—গ্রাহী। চিতামূল—আগ্নেয়। শুঁঠ—গ্রাহী। পিপুল—ত্রিদোষপ্রশমক। মরিচ—গ্রাহী। জামছাল—সংগ্রাহী। দারুহরিদ্রা—কফপিত্ত নাশক। চিরাতা—সারক। ইন্দ্রযব অতিসার নাশক। কুড়চি—সংগ্রাহী।

আমাদোষের পাচন জন্য 'বার্ত্তাকু গুড়িকা' —সেবনের ব্যবস্থা দিলেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহার উপাদানগুলি,—

চতুঃপলং স্নূহী কাণ্ডাৎ ত্রিপলং লবণত্রয়াৎ।
বার্ত্তাকু কুড়বশ্চার্কাদষ্টে দ্বে চিত্রকাৎ পলে॥
দগ্ধানি বার্ত্তাকু রসে গুড়িকা ভোজনত্তরাঃ।

সিজবৃক্ষের গুঁড়ির ছাল ৩২ তোলা, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব ও বিট লবণ ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা, বেগুণ ৩২ তোলা, আকন্দ মূলের ছাল ৬৪ তোলা ও চিতামূল ১৬ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া তাহার পর বেগুনের রসে বাটিয়া দুই আনা পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। গ্রহণী রোগে আমদোষের পরিপাক জন্য এই ঔষধ শীতল জল অনুপানে দিবসে ১ বার বা ২বার ব্যবস্থেয়। এই ঔষধের উপাদানগুলির পরিচয়—

সিজবৃক্ষের গুড়ির ছাল—
সেহুণ্ডো রেচন স্তীক্ষ্ণো দীপনঃকটুকো গুরুঃ।
শূলমতীলিকাধ্মান কফ গুল্মোদরানিলান্॥

উন্মাদ মোহ কুষ্ঠার্শঃ শোথ মেদোঽশ্ম পাণ্ডুতাঃ
ব্রণ শোথ জ্বর প্লীহ বিষদূষী বিষং হরেৎ ॥

ইহা রেচক, তীক্ষ, অগ্নির উদ্দীপক কটু ও গুরু। ইহা ব্যবহারে শূল, অষ্টিলিকা, আধ্মান, কফ, গুল্ম, উদর রোগ, বায়ু, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, মেদোরোগ, অশ্মরী, পাণ্ডুরোগ, ব্রণ, শোথ জ্বর, ও দূষী বিষ নষ্ট হয়।

সচস লবণ—আগ্নেয়। সৈন্ধব—দীপক, পাচন। বিট—দীপন।

বেগুন—

বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাক সপিত্তলম্।
জ্বরবাত বলাশঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু ॥

বেগুন—স্বাদু, তীক্ষ, উষ্ণ, পাকে কটু, জ্বরঘ্ন, বায়ুনাশক, কফঘ্ন, আগ্নেয়, শুক্রজনক ও লঘু। ইহা পিত্তজনক নহে।

আকন্দমূলের ছাল—অতীসার নাশক। চিতামূল—আগ্নেয়।

স্বল্প গঙ্গাধর চূর্ণ নামক ঔষধটিও অন্যান্য ঔষধের সহিত একবার করিয়া ব্যবহার করাইতে পারা যায়। ইহার উপাদান—

মুস্ত সৈন্ধবশুণ্ঠীভির্ধাতকী লোধ্র বৎসকৈঃ।
বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্র যববালকৈঃ ॥
আম্রবীজ শতবিষা লজ্জাচেতী সুচূর্ণিতম্।

মুথা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, কুড়চি মূলের ছাল, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রবীজ, আতইচ ও বরাহক্রান্তা—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা এক আনা, মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেব্য।

ইহার উপাদানগুলির গুণ—

মুথা—আগ্নেয়। সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষ নাশক। শুঁঠ—গ্রাহী। ধাইফুল—গ্রহণী নাশক। লোধ—অতীসার নাশক। কুড়চিছাল—রক্ত রোধক। বেলশুঁঠ—অতীসার নাশক। মোচরস—গ্রাহী। আকনাদি—গ্রাহী। ইন্দ্রযব—অতীসার নিবারক। বালা—দীপন ও পাচক। আম্রবীজ—অতীসার নিবারক। আতইচ—পাচক ও আগ্নেয়।

স্বল্প লবঙ্গাদি ও বৃহল্লবঙ্গাদি চূর্ণ এবং স্বল্প নায়িকা ও মধ্যমনায়িকা চূর্ণ নামক ঔষধও গ্রহণীরোগে অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

নিম্নে উহাদের উপাদানগুলি বলা যাইতেছে—

স্বল্প লবঙ্গাদি চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং বিল্বং পাঠাচ শাল্মলী।
জীরকং ধাতকী পুষ্পং লোধ্রেন্দ্রযব বালকম্ ॥
ধান্য সর্জ্জরসং শৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা যাবশূকঞ্চ সৈন্ধবং সরসাঞ্জনম্।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।

লবঙ্গ, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ, আকনাদি, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, শ্বেতধুনা, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধব লবণ ও রসাঞ্জন। সমস্ত চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা দুই আনা। অনুপান ঘোল।

লবঙ্গ—

লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিতম্।
দীপনং পাচনং রুক্ষং কফ পিত্তাস্র নাশকৃৎ ॥
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশুবিনাশয়েৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্ ॥

ইহা কটু, তিক্ত, লঘু চক্ষুর হিতকারক, শীতল, দীপন, পাচক ও রোচক। কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমন, আধ্মান, শূল,

কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়রোগে আশু উপকারক।

আতইচ—পাচক। মুথা—গ্রাহী। বেলশুঁঠ—গ্রাহী। আকনাদি—অতীসার নাশক। মোচরস—গ্রাহী। জীরা—পাচক। ধাইফুল—গ্রাহী।

লোধ—

লোধ্রোগ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্য কফপিত্তনুৎ।
কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ জ্বরাতিসার শোথহৃৎ॥

ইহা গ্রাহী, লঘু, শীতল, চক্ষুষ্য, কফপিত্ত নাশক ও কষায়। রক্তপিত্ত, রক্তগত জ্বর, অতীসার ও শোথরোগে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

ইন্দ্রযব—গ্রাহী। বালা—দীপন ও পাচক।

ধনে—

ধান্যকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণ বীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্॥
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহী স্বাদুপাকী ত্রিদোষনুৎ।
তৃষ্ণাদাহ বমিশ্বাস কাস কার্শ্য ক্রিমি প্রণুৎ॥

ধনিয়া—কষায় রস, স্নিগ্ধ, বলনাশক, মূত্রকারক, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, আগ্নেয়, পাচক, জ্বরঘ্ন, রোচক, গ্রাহী, পাকে মিষ্টরস, ও ত্রিদোষ নাশক। তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, কৃশতা ও ক্রিমি ইহা দ্বারা নষ্ট হয়।

শ্বেতধুনা—

রালোহিমো গুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ।
দোষাস্র স্বেদবীসর্প জ্বর ব্রণ বিপাদিকাঃ॥
গ্রহভগ্নাগ্নি দগ্ধা স্রো শূলাতীসার নাশনঃ॥

ইহা শীতল, গুরু, তিক্ত, কষায় ও গ্রাহী। বাতাদি দোষ, রক্তদোষ, স্বেদ, বীসর্প, জ্বর ব্রণবিপাদিকা, গ্রহ, ভগ্ন রোগ অগ্নিদগ্ধ শূল ও অতীসার রোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

কাঁকড়াশৃঙ্গী—কফ নাশক, ঊর্দ্ধগ বায়ু নিবারক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। পিপুল—ত্রিদোষ নাশক। শুঁঠ—গ্রাহী। বরাহক্রান্তা ও যবক্ষার—আগ্নেয়। সৈন্ধব—আগ্নেয়। রসাঞ্জন—রক্তরোধক।

বৃহল্লবঙ্গাদি চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পিপ্পলী মরিচানিচ।
সৈন্ধবং হবুষা ধান্যং কটফলং পুষ্করং তথা॥
জাতীকোষফলাজাজী সৌবর্চ্চল রসাঞ্জনম্।
ধাতকী মোচকং পাঠা পত্রং তালীশ কেশরম্॥
চিত্রকঞ্চ বিড়ঞ্চৈব তুম্বুরুর্ব্বিল্বমেবচ।
ত্বগেলা পিপ্পলীমূলমজমোদা যমানিকা॥
সম বৎসকং শুণ্ঠী দাড়িমং যাব শূকজম্।
নিম্ব সজ্জর্রসং ক্ষীরং সামদ্রং টঙ্কনং তথা॥
হ্রীবেরং কুটজঞ্চৈব জম্বাম্রং কটুরোহিণী।
অভ্রকং পুটিতং লৌহং শুদ্ধ গন্ধক পারদম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ॥

লবঙ্গ, আতইচ, মুথা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষ (অভাবে ধনে), কটফল, কুড়, জৈত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচল লবণ, ধাইফুল মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, নাগেশ্বর চিতামূল, বিটলবর্ণ তিতলাউ, বেলশুঁঠ, দারু চিনি, এলাইচ, পিপুল মূল বনযমানি, যমানি, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িম্ব ফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধুনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেন, কটকী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ। সমস্ত চূর্ণ সমান ভাগ। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা। অনুপান চাউল ধোয়া জল।

স্বল্প নায়িকা চূর্ণম্।

ত্রিশানং পঞ্চ লবণং প্রত্যেকং ত্র্যষণং পিচু।
গন্ধকান্ মাষকান ষ্টৌ চত্বারো মাসকা রসাৎ॥
ইন্দ্রাশনাৎ পলংশান ত্রিতয়াধিকমিষ্যতে।

পঞ্চ লবণ প্রত্যেক ১৷৷৹ তোলা এবং শুঁঠ পিঁপুল ও মরিচ প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধতোলা ও সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ৯৷৷৹ তোলা একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা। অনুপান কাঁজি।

পঞ্চলবণ—

সৈন্ধব—দীপক, পাচন। সচল—আগ্নেয়। সাম্ভার—বায়ুনাশক। বিট—বায়ুর অনুলোমক। কড়কচ—বায়ু নাশক শুঁঠ—গ্রাহী। পিপুল—ত্রিদোষ প্রশমক। মরিচ—গ্রাহী। গন্ধক—গ্রাহী। পারদ—ত্রিদোষ নাশক সিদ্ধি—পাচক।

মধ্যমনায়িকা চূর্ণম্।

কর্ষং গন্ধকমর্দ্ধপারদ যুতং কুর্য্যাচ্ছুভাং কজ্জলীম্।
ত্র্যক্ষাংশং ত্রিকটোশ্চ পঞ্চলবণাৎ সার্দ্ধঞ্চ কর্ষং পৃথক॥
সার্দ্ধাক্ষং দ্বিপলং বিচূর্ণ্য সকলং শক্রাশনম্মিশ্রিতাৎ।

গন্ধক ২ তোলা, পারদ ১ তোলা—একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ-ইহাদের প্রত্যেকটি ৪ তোলা এবং পঞ্চলবণের প্রত্যেকটি ? তোলা ও সিদ্ধিচূর্ণ, ১৯ তোলা, একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা। অনুপান কাঁজি।

বৃহন্নায়িকা চূর্ণম্।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
ভল্লাতকং যমানীচ হিঙ্গু লবণ পঞ্চকম্॥
গৃহধুমো বচা কুষ্ঠং ঘনমভ্রক গন্ধকম্।
ক্ষারত্রয়ংচাজমোদা পারদো গজপিপ্পলী।
অমীষাং চূর্ণকং যাবৎ তাবচ্ছক্রাশনস্য চ।
অভ্যর্চ্চ নায়িকাং প্রাতর্যোগিনীং কামরূপিণীম্॥

চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, ভেলা, যমানী, হিং, পঞ্চলবণ, ঝুল, বচ, কুড়, মুথা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্‌লী—এই ৩০টি দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সিদ্ধিচূর্ণ সকল চূর্ণের সমান। মাত্রা এক আনা, অনুপান ঘোল।

উপাদান গুলির গুণ—

চিতামূল—আগ্নেয়, পাচক। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। আমলকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া-কফ ও বায়ু নাশক। শুঁঠ—গ্রাহী। পিপুল—ত্রিদোষ নাশক। মরিচ—গ্রাহী। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিনাশক। হরিদ্রা—রক্তদোষ নিবারক। দারুহরিদ্রা—কফ পিত্ত প্রশমক। ভেলা—গ্রহণী নাশক * যমানী-আগ্নেয়। হিং—অগ্নির দীপ্তিকর। পঞ্চলবণ—আগ্নেয়।

---

* ভেলা—
ভল্লাতক ফলং পক্কং স্বাদুপাক রসং লঘু।
কষায়ং পাচনং স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণোষ্ণং ছেদিভেদনম্।
মেধ্যং বহ্নিকরং হন্তি কফবাতব্রণোদরম্।
কুষ্ঠার্শো গ্রহণী গুল্ম শোফানাহজ্বর ক্রিমীন॥
তন্মজ্জা মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো বাতপিত্তহা।
বৃন্তমারুষ্করং স্বাদু পিত্তঘ্নং কেশ্য সাগ্নিকৃৎ॥
তল্লাতকঃ কষায়োষ্ণঃশুক্রলো মধুরো লঘুঃ।
বাত শ্লেষ্মোদরানাহ কুষ্ঠার্শো গ্রহণী গদান্॥
হন্তিগুল্মজ্বর শ্বিত্রং বহ্নিমান্দ্য ক্রিমিব্রণান্॥

ঝুল গ্রহণী নিবারক। বচ—আগ্নেয়। কুড়—অরুচি নিবারক। মুথা—আগ্নেয়। অভ্র বলবর্দ্ধক। গন্ধক—গ্রাহী। যবক্ষার—আগ্নেয়। সাচিক্ষার—আগ্নেয়। সোহাগা—কফ নাশক, গ্রাহী, আগ্নেয়। বনযমানী—আগ্নেয়। পারদ—ত্রিদোশ প্রশমক। গজ পিপ্পলী—অতীসার নিবারক। সিদ্ধি—আগ্নেয়।

গ্রহণী শার্দ্দূল চূর্ণ, জাতিফলাদি চূর্ণ, ও মার্কণ্ডেয় চূর্ণ—নামক ঔষধ কয়টিও গ্রহণী রোগে হিতকর। ইহাদের উপাদান নিম্নে লেখা যাইতেছে—

গ্রহণী শার্দ্দূল চূর্ণম্।

রস গন্ধক লৌহাভ্রং হিঙ্গু লবণ পঞ্চকম্।
হরিদ্রে কুষ্ঠকঞ্চৈব বচা মুস্ত বিড়ঙ্গকম্॥
ত্রিকুট ত্রিফলা চিত্রমজমোদা যমানিকা।
গজোপকুল্যা ক্ষারাণি তথৈব গৃহধূমকম্।
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং বিজয়া চূর্ণকং সমম্।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিং, পঞ্চ লবণ হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, কুড়, বচ, মুথা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, বনযমানী, যমানী, গজপিঁপুল যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা ও ঝুল—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা এবং সিদ্ধি চূর্ণ ৬০ তোলা। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা। অনুপান চাউল ধোয়া জল।

জীরকাদি চূর্ণম্।

জীরকং টঙ্কনং মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম্।
বালকং শত পুষ্পাচ দাড়িমং কুটজং তথা॥
সমঙ্গাধাতকী পুষ্পং ব্যোষঞ্চৈব ত্রিজাতকম্।
মোচরসঃ কলিঙ্গঞ্চ ব্যোম গন্ধক পারদৌ।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবজ্জাতী ফলানিচ।

জীরা, সোহাগা, মুতা আকনাদি, বেলশুঁঠ, বালা, শুল্ফা, দাড়িমফলের ছাল, বরাহক্রান্তা ধাইফুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক ও পারদ—প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। সমস্ত চূর্ণের সমান জাতীফল চূর্ণ। মাত্রা এক আনা। অনুপান জল।

জাতী ফলাদি চূর্ণম্।

জাতীফলং বিড়ঙ্গানি চিত্রকং তগরং তথা।
তালিশং চন্দনং শুণ্ঠী লবঙ্গঞ্চোপকুঞ্চিকা।
কর্পূরঞ্চাভয়া ধাত্রী মরিচং পিপ্পলী তুগা।
এষামক্ষ সমান্ ভাগান্ চাতুর্জ্জাতক সংহিতান্॥
পলানি সপ্তভঙ্গস্য সিতা সর্ব্ব সমা তথা।

জাতীফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাদুকা (অভাবে সিউলি ছোপ) তালিশপত্র, রক্ত চন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র; এলাইচ ও নাগেশ্বর; প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সিদ্ধি-চূর্ণ ৫৬ তোলা। সমুদয় চূর্ণের সমান্ চিনি। মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা। অনুপান শীতল জল।

মার্কণ্ডেয় চূর্ণম্।

শুদ্ধ সূতঞ্চ গন্ধঞ্চ হিঙ্গুলং টঙ্কনং তথা।
ব্যোষং জাতীফলঞ্চৈব লবঙ্গ তেজপত্রকম্॥
এলাবীজং চিত্রকঞ্চ মুস্তকং গজপিপ্পলী।
নাগরং সজলঞ্চাভ্রং ধাতক্যতিবিষা তথা॥
শিগ্রুজং শাল্মলঞ্চৈবমহিফেনং পলাংশকম্।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জাতীফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, চিতামূল, মুথা, গজপিঁপুল, শুঁঠ,

বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতইচ, সজিনা বীজ, মোচরস ও অহিফেন—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা। মাত্রা অর্দ্ধ আনা হইতে এক আনা। সংগ্রহ গ্রহণী রোগে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

সংগ্রহ গ্রহণী রোগে মোদক ঔষধ বিশেষ উপকারী। মদন মোদক, মেথী মোদক, বৃহন্মেথী মোদক, মুস্তকাদ্য মোদক, জীরকাদি মোদক, বৃহজ্জীরকাদি মোদক, প্রভৃতি ঔষধগুলি একবার করিয়া ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। আবশ্যক বিবেচনায় কামেশ্বর মোদক, মহাকামেশ্বর মোদকেরও ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু আমাদের মতে সিদ্ধি ঘটিত ঔষধের প্রয়োগ যত না করা যায়, ততই মঙ্গল। বৃহজ্জীরকাদি মোদকটি সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণী রোগে অতি উত্তম ব্যবস্থা। আমরা এই ঔষধ গ্রহণী রোগের সকল স্থলেই ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে সকল মোদকগুলিরই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

মদন মোদকঃ।

ত্রৈলোক্য বিজয়াপত্রং সবীজং ঘৃত ভর্জ্জিতম্।
সমে শিলাতলে পশ্চাচ্চূর্ণয়েদতি চিক্কণম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী কুষ্ঠধান্যক সৈন্ধবম্।
শঠী তালীশপত্রঞ্চ কট্ ফলং নাগকেশরম্॥
অজমোদা যমানী চ যষ্টীমধুক মেবচ।
মেথী জীরক যুগ্মঞ্চ গৃহীত্বা শ্লক্ষ চূর্ণিতম্॥
যারন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদ্দেব তদৌষধম্।
তাবদেব সিতা দেয়া যাবদায়াতি বন্ধনম্॥
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ত্রিসুগন্ধি সমাযুক্তং কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ॥
স্থাপয়েদ্ ঘৃত ভাণ্ডেচ শ্রীমন্মদন মোদকম্!

ঘৃতে ভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ ২১ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড় ধনে, সৈন্ধব, শঠী, তালীশপত্র, তেজপত্র, কটফল, নাগেশ্বর, বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা ও কৃষ্ণজীরা—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, চিনি ৮৪ তোলা। একত্র পাক করিয়া নামাইয়া দারুচিনি, তেজপত্র, ও এলাইচ চূর্ণ ও কর্পূর মিশাইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা। সন্ধ্যার সময় সেব্য।

মেথী মোদকঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্ত জীরকদ্বয় ধান্যকম্।
কট্ ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী সৈন্ধবং বিড়ম্॥
তালীশ কেশরং পত্রত্বং গেলা চ ফলং তথা।
জাতীকোষ লবঙ্গঞ্চমুরা কর্পূর চন্দনম্॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তু মেথিকা।
সংচূর্ণ্য মোদকঃ কার্য্যঃ পুরাতন গুড়েনচ॥
ঘৃতেন মধুনা কিঞ্চিৎ খাদেদগ্নি বলং প্রতি।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিটলবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন—প্রত্যেকের চূর্ণ সমান ভাগ। সকল চূর্ণের সমান মেথী এবং মেথীচূর্ণ সহ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়। যথাযোগ্য জল সহ পাক করিবে। পাক সম্পন্ন হইলে ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে।

মাত্রা ।০ আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা। অনুপান জল।

ইহার উপাদানগুলির পরিচয়—

শুঁঠ—গ্রাহী। পিঁপুল—ত্রিদোষ নাশক। মরিচ—গ্রাহী। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। আমলকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া—কফ পিত্ত প্রশমক। মুথা—আগ্নেয়। জীরা—অগ্নি দীপ্তিকর। কৃষ্ণজীরা—আগ্নেয়। ধনে—অতীসার নাশক। কটফল—অরুচি নিবারক। কুড়—কফ নাশক। কাঁকড়াশৃঙ্গী—উর্দ্ধগ বায়ু নাশক। যমানী—আগ্নেয়। সৈন্ধব—ত্রিদোষ প্রশমক। বিটলবণ—আগ্নেয়। তালিশপত্র—কফ ও বায়ু নিবারক। নাগেশ্বর—কফ ও পিত্তনাশক। তেজপত্র—কফ ও বায়ুনাশক। দারুচিনি—বায়ু ও পিত্তনিবারক। এলাইচ—আগ্নেয়। জাতীফল—গ্রাহী। জৈত্রী—আগ্নেয়। লবঙ্গ—গ্রাহী। মুরামাংসী—বায়ু পিত্ত নাশক।

কর্পূর—

কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ।
সুরভির্ম্মধুরস্তিক্তঃ কফ পিত্ত বিষাপহঃ॥
দাহ তৃষ্ণাস্য বৈরস্য মেদো দৌর্গন্ধ্য নাশনঃ।
আক্ষেপশমনো নিদ্রাজননো ঘর্ম্মবর্দ্ধনঃ॥
বেদনাহারকঃ কামশান্তী কৃচ্ছ্র ক্রমেহ হৃৎ।

রক্তচন্দন—রক্তদোষ নিবারক।

মেথী—

মৈথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মঘ্নী জ্বরনাশিনী।
রুচিপ্রদা দীপনীচ রক্তপিত্ত প্রকোপিনী॥

মেথী—বায়ুনাশক, শ্লেষ্মানাশক, জ্বরঘ্ন, রুচিপ্রদ, অগ্ন্যদ্দীপক ও রক্তপিত্ত প্রকোপক।

বৃহন্মেথী মোদক।

ত্রিফলা ধান্যকং মুস্তং শুন্ঠী মরিচ পিপ্পলী।
কটফলং সৈন্ধবং শৃঙ্গী জীরকদ্বয় পুষ্করম্॥
যামনী কেশরং পত্র তালীশং বিড়মেব চ।
জাতিফলং ত্বগেলা চ জয়িত্রীন্দু লবঙ্গকম্॥
শতপুষ্পা মুরা মাংসী যষ্টি মধুক পদ্মকম্।
চব্যং মধুরিকা দারু সর্ব্বমেতৎ সমং ভবেৎ॥
যাবন্তো তানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রা তু মেথিকা।
সিতয়া মোদকং কার্য্যং ঘৃতমাধ্বীক সংযুতম॥

ত্রিফলা, ধনে, মুথা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, কটফল, সৈন্ধবলবণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, যমানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশপত্র, বিটলবণ, জাতীফল, দারুচিনি, এলাইচ, জৈত্রী, কর্পূর, লবঙ্গ, শুল্‌ফা, মুরা মাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, চৈ, মৌরী ও দেবদারু—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান ভাগ, সকল চূর্ণের সমান মেথী এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া যথাযোগ্য জলে পাক করিবে।

হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। আমলকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া—কফপিত্ত প্রশমক। ধনে—অতীসার নাশক। মুতা—আগ্নেয়। শুঠ—গ্রাহী। পিঁপুল—ত্রিদোষ নাশক। মরিচ—গ্রাহী। কটফল—অরুচি নাশক। সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক। কাঁকড়াশৃঙ্গী—উর্দ্ধগ বায়ু নাশক। জীরা—আগ্নেয়। কৃষ্ণজীরা—আগ্নেয়। কুড়—কফ নাশক। যমানী—আগ্নেয়। নাগেশ্বর—আমপাচক। তেজপত্র—কফ ও বাতঘ্ন। তালীশপত্র—কফবাতঘ্ন। বিটলবণ—অগ্নিকারক। জাতিফল—গ্রাহী। দারুচিনি—বায়ু ও পিত্তনাশক। এলাইচ—আগ্নেয়। জৈত্রম—আগ্নেয়। কর্পূর—কফপিত্তঘ্ন। লবঙ্গ—গ্রাহী।

শুল্‌ফা—

শতপুষ্পালঘুস্তীক্ষ্ণ পিত্তকৃৎ দীপনী কটুঃ।
উষ্ণা জ্বরানিল শ্লেষ্ম ব্রণ শূলাক্ষি রোগহৃৎ॥

ইহা লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তকারক, অগ্নির উদ্দীপক, কটু, উষ্ণ, জরঘ্ন, বায়ু, দমনকারী, শ্লেষ্ম নাশক, এবং ব্রণ, শূল, ও চক্ষুরোগ নষ্ট করে।

মুরামাংসী —বায়ুপিত্ত নাশক। যষ্টিমধু - বমি, তৃষ্ণা গ্লানি প্রভৃতি নিবারক। পদ্ম কাষ্ঠ – শ্লেষ্মঘ্ন। চই—কফ ও বায়ু নাশক। মৌরী—আগ্নেয়। দেবদারু—আগ্মান নিবারক, আমদোষ নাশক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। মেথী—আগ্নেয়। চিনি—শীতল, রক্তপিত্ত নাশক ও লঘু।

মুস্তকাদ্যমোদকঃ।

ধান্যকং ত্রিফলা ভৃঙ্গং ত্রুটিঃ পত্রং লবঙ্গকম্।
কেশরং শৈলজং শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানিচ॥
জীরকং কৃষ্ণজীরঞ্চ যমানী কটফলং জলম্।
ধাতকী পুষ্পকং ব্যাধিৰ্জ্জাতীকোষ ফলেত্বচম্॥
মধুরিকাচাজমোদা হবুষঃ নগপণ্যাপি।
উগ্রগন্ধা শঠী মাংসী কুটজস্ত ফলং শুভা॥
এতানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েদ কুশলো ভিষক।
সর্ব্বচূর্ণ সমং দেয়ং জলদস্তাপি চূর্ণকম্॥
সিতা চ দ্বিগুণা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ॥

ধনে, ত্রিফলা, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, শিলাজতু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, কটফল, বালা, ধাইফুল, কুড়, জৈত্রী, জায়ফল, দারুচিনি, মৌরী, বনযমানী, হবুষ, তাম্বুল, বচ, শঠী, জটামাংসী ও ইন্দ্রযব—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ সমভাগ, সমুদয় চূর্ণের সমান মুথাচূর্ণ এবং মুথাচূর্ণ সহ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। একত্র মিশাইয়া যথারীতি পাক করিয়া পাক শেষ হইলে ঘৃত মধু সহ মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা।০ আনা হইতে অৰ্দ্ধ তোলা।

ধনে—অতীসার নাশক। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। আমলকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া—কফপিত্তঘ্ন। দারুচিনি—বায়ু ও পিত্তঘ্ন।

ছোট এলাইচ,—

এলা সূক্ষ্মা. কফ শ্বাস, কাসার্শো মূত্রকৃচ্ছহৃৎ।
রসেতু কটুকা শীতা লঘ্বী বাত হরমত॥

ইহা কটু, শীতল, লঘু ও বায়ু নাশক। কফ, কাস, শ্বাস, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ রোগ ইহা ব্যবহারে উপশমিত হয়।

তেজপত্র—কফ বাতঘ্ন। লবঙ্গ—গ্রাহী। নাগেশ্বর – আমপাচক। বালা—দীপন ও পাচক। ধাইফুল —অতীসার নাশক। কুড় কফ নাশক। জৈত্রী —আগ্নেয়। জায়ফল—গ্রাহী। দারুচিনি – বায়ু ও পিত্ত প্রশমক। মৌরী – আগ্নেয়। বনযমানী—আগ্নেয়।

হবুষ—

হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদুষ্ণা তুবরা গুরুঃ।
পিত্তোদর সমীরার্শো গ্রহণী গুল্ম শূলহৃৎ॥

ইহা আগ্নেয়, তিক্ত, মৃদু, উষ্ণ, কষায় ও গুরু। ইহা পিত্ত, উদর রোগ বায়ু, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূলরোগ নাশক।

তাম্বূল—

তাম্বূলং বিশদং রুচ্যং,
তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরং সরম্।
বশ্যং তিক্তং কটুক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘুঃ॥
বল্যং শ্লেষ্মাস্ত দৌর্গন্ধ্যমলবাত শ্রমাপহম্॥

ইহা বিশদ, রোচক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কষায়, সর, বশ্য, তিক্ত, কটুক্ষার, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক, শ্লেষ্মনাশক, মুখের দুর্গন্ধ নিবারক, মলাপহারক, বায়ুনিবারক ও শ্রম শান্তিকর।

বচ—কফ নাশক। শঠী—আগ্নেয়। জটামাংসী—ত্রিদোষ নাশক। ইন্দ্রযব—অতীসার নাশক। মুথা—ধারক। চিনি—কফ নাশক।

(ক্রমশঃ)

† বচ তিন প্রকার। খুরাসানী বচ, সুগন্ধা বচ ও মহাভরী বচ। সচরাচর মহাভরী বচই প্রচলিত, ইহার অপর নাম কুলীঞ্জন। এই মহাভরী বচ—সুগন্ধ, উগ্রগন্ধ, কফ নাশক, কাসরোগে উপকারক ও রোচক। ইহা কণ্ঠের সুস্বর কারক, এবং হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখ নির্ম্মল করে।

ব্যাধিতত্ত্ব।

(বায়ুই জীবচৈতন্য)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[শ্রী—পাইকর—বীরভূম]

এদেশে আজকাল যেমন চটের কল, পাটের কল, তেলের কল, লৌহের কল প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, আমাদের দেহও তদ্রূপ একটী কল বিশেষ। আবার সেই সব কলের উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেমন কলের দেহযন্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষয়পূরণার্থও নিয়োজিত হয় তদ্রূপ আমাদের দেহযন্ত্রোৎপন্ন বায়ু, পিত্ত কফ, ও শোণিত প্রভৃতিও দেহযন্ত্রের ক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে। এই দেহ যন্ত্রের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ কলের ন্যায় ইহাও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রের সমষ্টি মাত্র। চক্ষুঃ কর্ণাদি জ্ঞানযন্ত্র, বাক্ পাণ্যাদি কর্ম্মযন্ত্র এবং প্রাণ অপাণাদি পোষণযন্ত্র আমাদের দেহান্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র বিশেষ।

আবার বিদ্যুৎশক্তি অথবা বাষ্প (Steam) দ্বারা যেমন পূর্ব্বোক্ত কলকারখানাদি যাবৎ যন্ত্রচালিত হইয়া থাকে, তেমনই দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের ক্রিয়া আলোচ্য বায়ুদ্বারা সম্পাদিত হয়। তাই সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

"তত্র প্রস্পন্দনোদ্বহন পূরণ বিবেক
ধারণ লক্ষণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রবিভক্ত
শরীরং ধারয়তি।"

অর্থাৎ বায়ুর লক্ষণ পাঁচ প্রকার। যথা :— প্রস্পন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিবেক ও ধারণা। এই পাঁচ প্রকার ক্রিয়া দ্বারা বায়ু শরীরকে ধারণ করে। প্রস্পন্দন শব্দের অর্থ—গতি বা চলন। উদ্বহন শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া। পূরণ শব্দের অর্থ—আহার দ্বারা শরীর পূরণ। বিবেক শব্দের অর্থ—রস মূত্রাদি প্রভৃতি ধাতুকে পৃথক্ করা। (বিবেক শব্দ বিচ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, এই বিচ্ ধাতুর অর্থ পৃথক্ করণ) আর অবশিষ্ট ধারণ শব্দটীর অর্থ ধরিয়া থাকা বা রক্ষা করা।

আবার দেখা যায় বাষ্প অথবা বিদ্যুৎ শক্তি কোন কলের যন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় বাধাপ্রাপ্ত হইলে, যেমন তাহার স্বচ্ছন্দে গতি ব্যাহত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ দেহযন্ত্রের ভিতর দিয়া চলাচল করিবার সময় কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হইলে প্রাণবায়ুও স্বচ্ছন্দগতি থাকে না। বলা বাহুল্য, প্রাণ বায়ু ও জীবনী শক্তির ঈদৃশ বাধার নামই ব্যাধি। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, দেহযন্ত্রের মধ্যে সাধারণতঃ দ্বিবিধ শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটীর নাম প্রাণ-বায়ু বা জীবনীশক্তি, অপরটীর নাম রাসায়নিক শক্তি। প্রাণবায়ু যতক্ষণ রাসায়নিক শক্তির উপর স্বীয় প্রভুত্ব রক্ষা করিতে পারে, ততক্ষণ দেহ মধ্যে তাহার ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। কিন্তু প্রাণ-বায়ু যখন রাসায়নিক শক্তির দ্বারা পরাভূত হইয়া পড়ে—তখন দেহ যন্ত্রের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ দৃষ্ট হয়। আমরা যে সকল বস্তু পানীয় ও আহার্য্যরূপে

গ্রহণ করিয়া থাকি, তৎ সমুদয় দেহস্থ হইলে তাহাদের মধ্যে' পচন বা রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিত প্রভৃতি দেহ পোষণকর বস্তু উৎপন্ন হইয়া দেহস্থ ক্ষয়প্রাপ্ত বায়ু, পিত্ত. কফ ও শোণিত আদির ক্ষয় পূরণ করে। কিন্তু যখন উৎপন্ন বায়ু পিত্তাদির আধিক্য, বিকৃতি ও প্রকোপ প্রভৃতি বিবিধ গোলযোগের সূত্র পাত হয়, তখন তাহার ফলে দেহস্থ ক্ষয় প্রাপ্ত বায়ু পিত্তাদির যথাযথ পূরণ না হইয়া তাহাদের বৃদ্ধি বিকৃতি প্রকোপ প্রভৃতি নানারূপ অনর্থ উপস্থিত হয়। আমরা ক্রমে যথাস্থানে এই পচন তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিব।

সুশ্রুত বলেন—

"তস্মা দৃষ্ট হেতু কেন বিশেষেণ পক্কাশয়
মধ্যস্থং পিত্তং চতুর্ব্বিধ মন্নপানং পচতি
বিরেচয়তি চ দোষরসমূত্র পুরীষাণি তত্রস্থ
মেব চাত্মশক্ত্যা শেষাণাং পিত্তস্থা নানাং
শরীরস্য চাগ্নি কর্ম্মানু গ্রহং করোতি,
তস্মিনপিত্তে পাচকোহগ্নিরিতি সংজ্ঞা ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম প্রসূত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া পিত্ত নামক পাচকাগ্নি পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া ভক্ষ্য পেয়াদি চতুর্ব্বিধ অন্ন ও পানীয় দ্রব্যকে পাক করে এবং তাহার ফলে বায়ু পিত্ত কফ নাশক ত্রিদোষ অন্নরস মূত্র ও পুরীষ পৃথক হইয়া যায়। আর সেই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া পাচকাগ্নি আত্মশক্তির দ্বারা শরীরের অন্যান্য স্থানীয় পিত্তদিগকে উষ্মা বিতরণ করিয়া থাকে।

উল্লিখিত বচন দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, শরীরের মধ্যে সর্ব্বদাই পচন ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে এবং সেই ক্রিয়া একমাত্র প্রাণ-বায়ুর দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বায়ুর ক্রিয়া অসংখ্য হইলেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথাঃ—প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান্ ও অপান। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও বায়ুর এইরূপ পঞ্চবিধ ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য মতে বায়ুর ক্রিয়া বলিয়া কোন উল্লেখ নাই বটে কিন্তু প্রকারান্তরে তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ পাশ্চাত্য মতে যাহা স্নায়ুর (nerve) ক্রিয়া, আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহাই বায়ুর ক্রিয়া। আর্য্যমতের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাণ বায়ুই স্নায়ুর উপর ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া দেহের আবশ্যকীয় যাবতীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদের যে যে বায়ু, পাশ্চাত্য মতে যে যে নামে অভিহিত হইয়া থাকে নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হই তেছে.—

	আর্য্যমতে	পাশ্চাত্য মতে।
১।	প্রাণ বায়ু	নার্ভ সেণ্টার্স ইন্দি মেডুলা"
২।	উদান বায়ু	"স্পীচ সেণ্টার"
৩।	সমান বায়ু	"এপি গ্যাষ্টক্ প্লেকস স"
৪।	ব্যান বায়ু	"মোটের্ সেন্সরী নার্ভস্"
৫।	আপান বায়ু	হায়প গ্যাষ্ট্রীক প্লেক্সস্।

সুশ্রুত বলেন,

নর্ত্তে দেহ কফাদস্তি ন পিত্তাৎ ন চ মারুতাৎ। শোণিতাদপি বানিত্যম্ দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে। অর্থাৎ এই শারীর বায়ু পিত্ত, কফ ও শোণিত এই চারিটী ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত, সুতরাং দেহের মধ্যে এই চারিটী ধাতু ভিন্ন

অতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই। মাংস, অস্থি, শিরা, স্নায়ু, নখ, কেশ প্রভৃতি দেহের অন্য যাবৎ দ্রব্যই এই চারিটী ধাতু হইতে উৎপন্ন। তবে এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এক বায়ুই অন্য তিনটী ধাতুর সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের পোষণ ও ধারণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

স্বয়ং শ্রুতিও পূর্ব্বোক্ত সৃজন প্রক্রিয়ার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলেন,—আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরা পোহদ্ভ্যঃ পৃথিবী" অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ, হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। পরে এই উৎপন্ন পঞ্চ ভূতের দ্বারা পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি বিশ্বের তাবৎ পদার্থই নির্ম্মিত হইয়াছে। আম্রের আষ্টির (আঁষ্টির) মধ্যে যেমন তজ্জাত বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, মুকুল, ফল প্রভৃতি তাবৎ পদার্থের বীজ নিহিত থাকে এবং কাল উপস্থিত হইলে সেই সমুদয় বীজ যেমন ক্রমে মূল, কাণ্ড,শাখা প্রভৃতিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ আকাশের মধ্যে বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই চারিভূত—পদার্থের বীজ নিহিত থাকে এবং কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ সেই আকাশ নিহিত বীজ হইতে ক্রমে বায়ু প্রভৃতি চারি ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে পঞ্চ ভূত—পঞ্চভূত দ্বারা বিশ্বরাজ্য বায়ুর সাহায্যে সৃষ্ট হইয়াছে। এবং পরে জল, তেজ ও বায়ুর সাহায্যে তাহার ক্ষয়ের পূরণ ও রক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। এই জল, তেজ ও বায়ুই আমাদের আলোচ্য কফ, পিত্ত ও বায়ু। এই ভূতত্রয় ব্যতীত ক্ষিতি ও আকাশ নামক ভূতদ্বয় ও শরীর নির্ম্মাণার্থ আবশ্যক। তাহারা জীবদেহের অবস্থান্তর ঘটাইতে সমর্থ নহে এবং এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আকাশ ও ক্ষিতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। ইহার বচন যথা,

"বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ সমাসতঃ।
বিকৃতা বিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি তে বার্ত্তয়ন্তি চ॥"

বিশ্বরাজ্যের ন্যায় প্রত্যেক জীবদেহই ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত। তাই আয়ুর্ব্বেদকার বলিয়াছেন।

"বিসর্গাদান বিক্ষেপৈ সোমসূর্য্যানিলাঃ যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফ পিত্তানিলা স্তথা॥"

অর্থাৎ—চন্দ্র শৈত্য দ্বারা, সূর্য্য তাপ দান দ্বারা এবং বায়ু এই শৈত্য ও তাপের যথা-যথ—সংস্থাপন দ্বারা যেমন জগৎকে পুষ্ট ও রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ শ্লেষ্মা শৈত্য দ্বারা, পিত্ত তাপ দ্বারা এবং শরীরস্থ বায়ু দেহ মধ্যে সেই শৈত্য ও তাপের যথাযথ সংস্থাপন দ্বারা দেহকে পুষ্ট ও রক্ষা করিতেছে। বিশ্ব রাজ্য পূর্ব্বে যেমন ছিল—মহাপ্রলয়ের কালে তাহার বীজ ঠিক তদনুরূপ থাকিয়া যায় অর্থাৎ এই বিলীন অবস্থায় বিশ্বরাজ্য গোচরীভূত না হইলেও পরে—যাহাতে বিশ্বরাজ্য পুনরায় সৃষ্ট হইতে পারে তাহার সংস্কার থাকিয়া যায়, এবং সৃষ্টি কাল উপস্থিত হইলেই সেই বিলীন বিশ্ব ক্রমে বিকশিত বিশ্ব হইয়া লোক চক্ষুর গোচরী-ভূত হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ আকাশ হইতে বায়ু ফুটিয়া উঠে ও পরে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্ট হয়। অতঃপর বায়ু— সূর্য্য হইতে তাপ ও চন্দ্র হইতে শৈত্য গ্রহণ করিয়া বিশ্বরাজ্যের সৃজন ও পোষণ করিয়া থাকে।

নরদেহের সৃষ্টি, পুষ্টি ও রক্ষা ব্যাপারে ও ঠিক এই এক নিয়মই ঘটিয়া থাকে। মনুষ্যের

মধ্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে তাহার জীবাত্মার তাবৎ শক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে অর্থাৎ উক্ত মনুষ্যের মৃত্যু হয়। এই সময় যে জাতীয় বীজ বা সংস্কার জীবাত্মায় বিলীন থাকে, জীবাত্মা ভাবী জন্মে সেই জাতীয় বীজের অনুরূপ দেহ ও শক্তি প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মনুষ্য মৃত্যুকালে তাহার জীবনব্যাপী কর্ম্মপ্রসূত ফল স্বরূপ কেবল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ শক্তির সংস্কার লইয়াই দেহত্যাগ করে না, পরন্তু জীবাত্মা তাহার স্থুল দেহ হইতে ক্ষিতি, অপ (শ্লেষ্মা) তেজ, (পিত্ত) মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম নামক পঞ্চভূতের বীজ স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম—সংস্কারক অর্থাৎ শক্তি সঙ্গে লইয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রে এই সূক্ষ্ম ভূতই পঞ্চ মহাভূত নামে পরিচিত। এই মহাভূতই ভাবী নরদেহের ভিত্তি স্বরূপ এবং তৎসহ চৈতন্যোপেত সপ্তদশ শক্তির যে সংস্কার বিদ্যমান থাকে, তাহাই সেই দেহ যন্ত্রের যন্ত্রী।

মোটের উপর দেখা যায় যে, কোন বৃক্ষের পক্ক ফল যেমন ভাবী বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র পুষ্প ও ফল প্রভৃতির বীজ ধারণ করে, তদ্রূপ মনুষ্যের বীজ অর্থাৎ জীবাত্মার মধ্যে মনুষ্য দেহ নির্ম্মাণক্ষম যাবৎ সংস্কার ও পঞ্চ মহাভূত নিহিত থাকে। পরে জন্মকাল উপস্থিত হইলে এই জীবাত্মা প্রথমতঃ তাহার জাতি অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি কোন জাতীয় পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরে মাতৃ-গর্ভে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষের বীজ যেমন মৃত্তিকা সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ মাতার জরায়ুর মধ্যে সংলগ্ন হয়। তৎপরে বৃক্ষের বীজ যেমন মৃত্তিকা, সার, জল, তাপ দ্বারা অঙ্কুরিত হইয়া পড়ে, জরায়ুসংলগ্ন জীবাত্মাও তদ্রূপ মাতৃদেহস্থ রস-রুধির গ্রহণ করিয়া তাহার ক্রিয়াযন্ত্র অর্থাৎ দেহ নির্ম্মাণ করে। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জীবাত্মা যে সকল সংস্কার ও ভূত পদার্থ লইয়া আসে, তৎসমুদয় পিতা ও মাতার সংস্কার ও তাঁহাদের দেহস্থ পঞ্চভূতের গুণাদির মূর্চ্ছনা প্রাপ্ত হয় এবং এই জন্যই সেই জীবাত্মা প্রসূত মনুষ্য পিতা মাতার সংস্কার ও তাঁহাদের দেহস্থ ভূত পদার্থের ন্যূনাধিক দোষ গুণ-ভাগী হইয়া থাকে।

সৃষ্টির পর জগৎ যেমন বায়ুর কর্তৃত্বাধীনে সূর্য্যের তাপ ও চন্দ্রের শৈত্যের সাহায্যে পুষ্ট ও রক্ষিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক নরদেহ বায়ুর প্রভুত্বে পিত্ত হইতে তাপ, তাপ ও কফ হইতে শৈত্য লাভ করিয়া পুষ্ট এবং জীবন্ত অবস্থায় বর্ত্তমান্ থাকে। তাই সুশ্রুত বলেন।

শীতাংশুঃ ক্লেদয়ত্যুর্ব্বীং বিশ্বান্ শোষয়ত্যপি।
তাবুভাবপি সংশ্রিত্য বায়ুঃ পালয়তি প্রজাঃ॥"

অর্থাৎ চন্দ্র পৃথিবীকে আর্দ্রীকৃত করে, সূর্য্য উহাদিগকে পোষণ করিয়া থাকেন। বায়ু উহাদের আশ্রয়ে প্রজাদিগকে পালন করিয়া থাকেন।

মোটের উপর দেখা যায়—কি বিশ্ব, কি নরদেহ, কি বিশ্বরাজ্যের যাবৎ জঙ্গম প্রাণী ও স্থাবর বস্তু—সমস্তই বায়ুর দ্বারা সৃষ্ট, পুষ্ট ও ধৃত রহিয়াছে। এবং সেই বায়ুর ক্রিয়ার লোপেই সমস্ত লুপ্ত হইতেছে। তাই ব্রহ্মা স্তব করিয়াছিলেন :-

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈ তৎ পাল্যতে দেবি! ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥

অর্থাৎ হে শক্তি দেবি! তোমার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে, আবার তোমার দ্বারাই অনন্ত জগৎ রক্ষিত হইয়া প্রলয় কালে বিধ্বস্ত হইতেছে। অতএব হে জগন্ময়ে! তুমিই সৃষ্টিকালে সৃজ্য বস্তু রূপা, এবং সৃষ্টি ক্রিয়া রূপা, পালন এবং সংহার বিষয়েও তুমিই যথাক্রমে, পাল্য, পালন সংহার্য্য ও সংহার স্বরূপা।

মোটের উপর দেখা যায় যে, একমাত্র বায়ুই জৈব রাজ্যের প্রাণ স্বরূপ। সুতরাং এই বায়ুর নাম প্রাণ বায়ু। তাই আমরা পূর্ব্বেই মৈত্রাপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, এই প্রাণ ক্রিয়াশক্তি বা রজোগুণ প্রধান প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত চিচ্ছক্তি। এই প্রাণ স্বীয় রূপকে দুই প্রকারে ধারণ করেন। দেহে ইনি যে আপনাকে প্রাণাপাণাদি পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন—তাহা ইঁহার একবিধরূপ এ ং ব্রহ্মাণ্ডকরও মধ্যে ইনি যে জগদবভাসক আদিত্যরূপে অবস্থান করিতেছেন তাহা ইঁহার অন্য প্রকার রূপ। বলা বাহুল্য, এই প্রাণের প্রাণাপানাদিই এস্থলে আমাদের আলোচ্য। কারণ এই পঞ্চ প্রাণই যাবৎ জীবদেহের সৃজন, পালন ও রক্ষাকর্ত্তা এবং সেই দেহরূপ যন্ত্রের যন্ত্রী। সুতরাং তিনিই জীব এবং তিনি সকলের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা।

বায়ুর এতাদৃশ একাধিপত্য দেখিয়াই স্বয়ং সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

"স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান বায়ুরিত্যভি শব্দিতঃ
স্বাতন্ত্র্যান্নিত্যভাবাচ্চ সর্ব্ব গত্বাৎ তথৈব চ
সর্ব্বেষামেব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোক নমস্কৃতঃ
স্থিত্যুৎপত্তি বিনাশেষু ভূতানামেব কারণম॥"

অর্থাৎ এই বায়ু স্বয়ম্ভু ও ভগবান বলিয়া, কথিত আছেন। কেননা, ইতি স্বতন্ত্র নিত্য ও সর্ব্বগ। ইনি সকলেরই সর্ব্বাত্মা—সর্ব্বলোক নমস্কৃত এবং ভূতগণের স্থিতি উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু। বায়ু অব্যক্ত অথচ ইহার কর্ম্ম ব্যক্ত।

স্বয়ং ভগবান গীতায়ও বলিয়াছেন।—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অর্থাৎ আমারই অভিন্ন অংশ স্বরূপ (জীব চৈতন্যরূপ) আর এক প্রকার শ্রেষ্ঠতমা প্রকৃতি আছে, তাহা উক্ত অষ্টবিধ প্রকৃতি অপেক্ষা বিশুদ্ধ; যে প্রকৃতি এই অনন্ত জগৎমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জৈবনিক ক্ষমতা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে, হে মহাবাহো! সেই প্রকৃতিটীকে তুমি জীব বলিয়া জানিবে।

পুনরায় :—

এতদযোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

অর্থাৎ এই যে সর্ব্ব সমেত নয় প্রকার প্রকৃতির কথা বলিলাম, ইহা হইতেই এই সস্থাবর-জঙ্গম বিশ্বের উৎপত্তি হইতে থাকে, কিন্তু ইহারা সকলেই যখন আমা (আত্মা) হইতে বিকশিত হইয়াছে, তখন আমিই (আত্মাই) এই অনন্ত জলাসয়ে মূল উৎপত্তি স্থান এবং পরিণাম ও লয়েরও স্থান, ইহা অবধারিত জানিবে।

আরও বলিয়াছেন :—

মত্ত পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়!।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥"

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! আমার পরে (আত্মার পরে) আর কিছুই নাই, আত্মাই জগতের আদিম ও শেষ অবস্থা, সূত্রে যেরূপ মণি-মুক্তাদি গ্রথিত থাকে, আমাতেও (আত্মাতেও) সেইরূপ এই অনন্ত কোটী জগৎ প্রোতভাবে (গ্রথিতভাবে) রহিয়াছে।

অতএব ইহা সহজেই প্রমাণ হয় যে, আয়ুর্ব্বেদের যাহা বায়ু—তাহাই অন্যরূপে জীব-চৈতন্য পদবাচ্য।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ২৯৬ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় যামার্দ্ধ কৃত্য শিক্ষা।

(ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার)

আমরা যেরূপ অভিভাবক ও শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া দেশকে পুনর্ব্বার প্রাচ্যভাবাপন্ন সুস্থ ও দীর্ঘায়ু করিয়া তুলিতে চাহিতেছি, তাহা এই ভীষণকাল স্রোতের বহুদূর ভাটির দিকে পিছাইয়া পড়া হেতু হয়তো অনেকে অসম্ভব মনে করিতে পারেন। বাস্তবিক তাহা নিতান্ত কষ্টসাধ্য এবং বহুকাল সাপেক্ষ হই-লেও শিক্ষার অধিকারী মনীষী ব্যক্তিদিগের করতলগত হইলে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কেননা এক কালে যাহা মানুষেই করিয়াছিল, আবার তাহাই মানুষেই করিবে, সুতরাং অসম্ভব কিসে?

দেশীয় নেতৃবৃন্দ শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলে যদি বর্ত্তমানের "গুরু ট্রেনিং" প্রথানু-সারে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক কতক-গুলি শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন, তবে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর পরেই তো গুরু প্রাপ্তির জোগাড় হইবে? সেই সকল গুরুর দ্বারা প্রাচীন রীত্যনুসারে বিদ্যালয় বা গুরু আশ্রম প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রকৃত সৎশিক্ষা দিতে থাকিলেই ২৫।২৬ বৎসর মধ্যে বহু গুরু এবং বহু অভিভাবক প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারিবে। যেমন বহুকাল ভাটির স্রোতে গা ঢালিয়া বহুদূর পশ্চাতে ছুটিয়া যাওয়া গিয়াছে, তেমনি পূর্ব্বের উজান ধরিয়া ঠিকানায় পৌছিতেও তদপেক্ষা অধিক সময় প্রয়োজন, যে হইবে—ইহা তো সহজেই বুঝা যায়, এখন হইতে উদ্বোধিত না হইয়া এই ভাবে তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া "ডুবেছি তো ডুবতে আছি, পাতাল কত দূরে দেখি" নীতির

"অনুসরণ করাও তো মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে।

বেদপাঠের অভ্যাসের সহিত ব্রহ্মযজ্ঞ ও মন্ত্রপাঠ, বিচার, অভ্যাস জপ. শিষ্যকে বেদদান, প্রভৃতি এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ ছন্দঃ, শাস্ত্র, জ্যোতিষ, নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গ এবং অন্যান্য যে সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এক্ষণে উথাপন করা অরণ্যে রোদন মাত্র। যদি কখনো সে শুভ দিন সমাগত হয়, তখন সে সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। অধুনা পড়া যে কি ভাবে হইতেছে, তাহার পরিচয় ফল দেখিয়া সকলেই লাভ করিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে অধুনা আমাদের যে অধীত বিদ্যা লাভ হইতেছে, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরের জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতি সভায় তাহার তাদৃশ সুফলই প্রসব করিয়া সভ্যতা শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতেছে। পড়া এবং লেখা বিদ্যার এই দুইটি অঙ্গ, তন্মধ্যে লেখার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও বি, এ, এম এ, প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত মহাশয়দিগের অধিকাংশের হস্তাক্ষর দেখিলেই লেখারও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে পড়া যতদিন না হয়, লেখাটা হইতে বোধ হয় তাহার অন্তরায় কিছুই দেখা যায় না। কেন না প্রবল অর্থ লিপ্সার দায়ে পড়িয়া যেন রাজোনুমোদিত ভাবে যাহা তাহা শিখিতে বাধ্য হইতে হয় কিন্তু হাতের লেখাটা ভাল করিলে তো সে অর্থলিপ্সার কোন ব্যাঘাত হয় না? তাই আমরা লেখার প্রাচ্য নিয়ম কিঞ্চিৎ এস্থলে আলোচনা করিব।

লিপিজ্ঞ ও লেখকোত্তম হইতে ইচ্ছা করিলে, পূর্ব্বাস্য উপবিষ্ট হইয়া শুভনক্ষত্রযুক্ত দিবসে শুভগ্রহ বারে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে পূজা করিয়া প্রথম লিখিতে আরম্ভ করিবে? মসী এবং পত্র (এখন কাগজ) ধারণে বাহুদ্বয় নিরোধ করিতে হইবে। সম অথচ শীর্ষোপেত এবং সুসম্পূর্ণ ও সম শ্রেণীগত অক্ষর সকলকে যিনি লিখিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া কথিত হন। লেখক ক্ষিপ্র হস্ত অথচ সুন্দর সুশৃঙ্খল অক্ষরে লেখনশীল হইবেন। যে ব্যক্তি মনোগত ভাবকে সংক্ষিপ্ত সসার ও সরল এবং সহজ ভাষায় লিখিতে সক্ষম তিনিই সুলেখক। সদ্বিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা যেমন দেহ ও মন পবিত্র হয় বলিয়া স্বাস্থ্যজনক হয়, সুন্দর ভাবে লিখিতে পারিলেও তেমনি মনের হৃষ্টতা উপস্থিত হয় বলিয়া স্বাস্থ্যজনক হইয়া থাকে। কারণ মনের দুঃখই রোগ এবং সুখই আরোগ্য বা স্বাস্থ্য।

যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাদান না করেন, তাঁহার কার্য্যহানি হয়। এবং তাঁহার মঙ্গলদ্বার অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। যেস্থলে সুন্দররূপ অধ্যয়ন-অধ্যাপনাতে অশ্রুত ব্যাখ্যা সুশ্রুত হয়, তথাকার লোক সকল ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত, রাজা সর্ব্বদা জয় বিশিষ্ট, অধ্যাপক সহ লোক সকল রোগশূন্য, ধন ধান্য সম্পন্ন এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকেন। অধ্যাপক এতদ্রূপ বিভাবিত দ্বারা জ্ঞাত এবং পরম্পরা আয়ত্ত শাস্ত্রার্থ শিষ্যবর্গকে সরল ও সুমিষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া বিচক্ষণ শিষ্টগণের সহিত কথা প্রসঙ্গদ্বারা, নানা ব্যাখান ভাবা দ্বারা, স্বকৃত চিহ্ন এবং যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রার্থ

চিন্তা ও ব্যাখ্যা স্মরণ করিবেন এবং প্রত্যহ সেই সকল ব্যাখ্যার আলোচনা করিবেন!

যে শিষ্য নিত্য গুরুকে পূজা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে বিদ্যা প্রসন্না হন। সেই বিদ্যা প্রভাবে সেব্যক্তি সর্ব্বসম্পত্তি ও স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুঃ লাভে সমর্থ হয়। যে গুরু একটীমাত্র অক্ষরও শিষ্যকে শিক্ষা দান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই যে, তাহা দিয়া সেই শিষ্য গুরুর নিকট অঋণী হইতে পারেন। যে শিষ্য এক গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং শুভ সংস্কার ল্যাভে কৃতী হইয়া, অন্য গুরুর কীর্ত্তি জন্মাইয়া দেয়, সে ব্রহ্মহত্যার পাপী হয়। পাঠক! শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাগুলির সহিত বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রথার কুভাব এবং বিপরীত ভাবগুলির দিকে নেত্রপাত করিলেই বুঝিবেন যে, আমরা কোথায়?

যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মূঢ়ত্ব প্রযুক্ত অধ্যাপনা বা আলোচনার অভাবে বিস্মৃত হয়, সে ব্যক্তি ভীমদর্শন নামক অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ হইতে অননুজ্ঞাত বেদ অধ্যয়ন করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মস্তেয় (বেদ চৌর্য্য) সংযুক্ত হইয়া—নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়া তদ্দারা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহই করে, এবং যে ব্যক্তি বিদ্যাদ্বারা পরের যশঃ নষ্ট করে তাহাদিগের সেই বিদ্যা পরলোকফলপ্রদা হয় না। ইষ্টদত্ত বস্তু এবং অধীত বিদ্যা বৃথা অহংকর্ত্তন দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই নিমিত্ত ইষ্টদান, এবং অধ্যয়ন করিয়া আত্মশ্লাঘা, অনুশোচনা এবং অনুকীর্ত্তন করিতে নাই, এসকল করিলে ফলজনক শক্তির বিশেষ হানি হইয়া থাকে। পরলোক এবং ধর্ম্ম ও যশোকামী যে ব্যক্তি অধ্যাপকদিগকে বৃত্তি দিয়া দ্বিজ সকলকে অধ্যয়ন করান, তাঁহার পৃথিবী মধ্যস্থ সকল বস্তুই দান করিয়া। অধুনা এই বিদ্যা দান প্রথার ঠিক বিপরীত বিদ্যাবিক্রয় এবং বিদ্যার্থীর অর্থ দণ্ড জরিমানা প্রভৃতি আদায় প্রথার সদৃশ পুণ্য অর্জ্জিত এবং মহদ্ধর্থ জগতে প্রচারিত হইতেছে, তাহার ফলেই যে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি নিত্য সহচর হইয়া উঠিয়াছে, আর্য্য শাস্ত্রে আস্থাবান হিন্দু ব্যতীত অপর কেহ তাহা বিশ্বাস করিবেন না। শিক্ষার প্রয়োজন কি? লেখা পড়া শিক্ষা না করিলে কি ক্ষতি হয়, এবং শিখিলেই বা কি লাভ হয়? এই প্রশ্নের সদুত্তর রূপে এক্ষণে আধুনিক শিক্ষিতগণ নিশ্চয়ই বুঝিয়া লইয়াছেন যে লেখা পড়া শিখিয়া দুই চারিটা পাশ করিতে পারিলে বড় চাকরী, ওকালতী ডাক্তারি প্রভৃতি বহু অর্থ সংগ্রহের উপযোগীতা লাভ করা যায়। অতএব ঐ সমুদয়ই লেখা পড়াশিক্ষা একমাত্র উদ্দেশ্য। এই মূলের উদ্দেশ হীন হওয়াতেই দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। আধুনিক শিক্ষার প্রথমোদ্দেশ্য যে কোনরূপে পাশ করা, কাজেই কেউ বা মুখস্তের জোরে, কেউবা প্রশ্নচুরিবিদ্যার সাহায্যে কেউ বা ঘুঁসের বন্দোবস্তে সেই পরমারাধ্য পাশপত্রখানি লাভ করিলেই শিক্ষার প্রথমোদ্দম ফুরাইল। কিন্তু সেই পাশ প্রাপ্তির পর তিনি যে কতখানি মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিলেন, কি স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে, কি গুরুজনের সন্মান বিষয়ে, কি স্বদেশবাৎসল্য বিষয়ে, কি অর্থনীতি, সমাজ নীতি বা ধর্ম্মনীতি বিষয়ে, কতটুকু জ্ঞান অর্জ্জন করিলেন, তাহা

পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কাহারো শক্তি, প্রবৃত্তি বা দরকার বোধই নাই। পাশ করিয়াছ বলিয়াই আমাদের উৎসব ছড়াইয়া উন্মত্তবৎ উল্লম্ফনেই সব পর্য্যবসিত হইয়া যায়। তার পর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অর্থাগম। তা সৎপথেই হউক, আর জাল জুয়াচুরি, চাতুরী—বা যে কোন উপায়েই হউক, চাই অর্থ! অর্থ!! পাপ আর পুণ্য এই দুইটী কথাই বাতুলের উক্তি। এই হ'চ্ছে বর্ত্তমান শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং পরিণতি।

বাস্তবিক এরূপ উদ্দেশ্যময় শিক্ষা যত কালই চলিবে, ততকালই দেশের লোক রোগ শোক জর্জ্জরীত দেহে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর আয়ুলাভ করিবে এবং ভাবীবংশ দিন দিন টিক্‌টিকির ন্যায় ক্ষুদ্র কলেবর প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। এই নিমিত্ত প্রাচীন একজন দূরদর্শী মহাত্মার মুখে আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি যে "ইহার পর এমন দিন আসিবে যখন বেগুণতলায় হাট লাগিবে। কথাটি কিন্তু ক্রমশই ফলে পরিণত হইতে চলিয়াছে!

শাস্ত্র বলেন—

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎ পশুহির্নানাম॥
জ্ঞানহি তেষামধিকো বিশেষ :—
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সামান্য॥

আহার, নিদ্রা, ভয় আর মৈথুন এই চারিটি সাধারণ গুণ পশুদিগেরও আছে, মানবেরও আছে। সে সকল সাধারণ গুণ ছাড়া জ্ঞানই মানবের-বিশেষতঃ বা মানবত্ব অর্থাৎ পশুগণ জ্ঞানার্জ্জনে অক্ষম, আর মানব তাহাতে সক্ষম। সেই জ্ঞান যাহার অর্জ্জন হয় নাই, সে জ্ঞান বিহীন সুতরাং সে পশুর সমান। পশুতে আর জ্ঞান বিহীন মানবে কিছুমাত্র প্রভেদ চিহ্ন লক্ষিত হয় না।

এক্ষণে যে জ্ঞান লাভ করিলে মানুষ পশু হইতে উন্নত হইয়া মানব আখ্যা লাভ করে সে জ্ঞান কি? জ্ঞান কাহার নাম? সাক্ষাৎ শঙ্কর স্বরূপ শঙ্করাচার্য্য মণিরত্ন মালা গ্রন্থে গুরুশিষ্যপ্রশ্নোত্তরচ্ছলে বলিয়াছেন,

"বোধোহিকো যস্থ বিমুক্তী হেতু।"

'জ্ঞান কাহাকে বলে? যাহা ভব বন্ধন মুক্তির হেতু।" কথাটা বড় অনেক উচ্চে উড়িয়া পড়িল! ইহাকে আরো বিশেষ করিয়া নিকটে আনিয়া আলোচনা করা দরকার।

সর্ব্বজ্ঞানবেত্তা মহাতপাঃ মনীষি পরামর্থ ঋষি, একদা রাজর্ষি জনককে প্রশ্নানুদায় বলিয়াছিলেন, 'হে রাজর্ষে! যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা শরীররথের শব্দাদি বিষয়-রূপ অশ্ব সমুদয়কে সংযমিত করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই জ্ঞানবান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

(পরাশর গীতা—২ অঃ।১।)

আবার ভগবান বলিয়াছেন,—"উজ্জল প্রদীপের ন্যায় যখন আত্মা চিত্তপটে প্রকাশিত হয়, তখনি পুরুষের পাপ ক্ষয় হইয়া প্রকৃত জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।"

এ সকল পরলোকৈষনা বা পারত্রিক চেষ্টা বিষয়ক জ্ঞান আশু আলোচ্য না হইলেও প্রকৃত জ্ঞানের আভাস প্রদান উদ্দেশ্যেই উহা লিখিত হইল। কারণ উক্তরূপ অত্যুন্নত জ্ঞান পর্য্যন্ত মানবের অর্জ্জনীয়। অনন্তর আমরা এক্ষণে চরকোক্ত প্রাণৈষনা অর্থাৎ প্রাণ রক্ষা বিষয়ক চেষ্টার যে শিক্ষা, যদ্দারা

মানব প্রকৃত স্বাস্থ্যবান হইতে পারে —তাহারই আলোচনা করিব। কারণ স্বাস্থ্যরক্ষাই সকল শিক্ষার সার, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, ইহার কোনটিই স্বাস্থ্যবিহীন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় না! এই নিমিত্ত অন্যান্য সর্ব্ব চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর বা স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা বিষয়ক শিক্ষালাভ করাই এস্থলে প্রকৃত জ্ঞানদায়ক এবং অবশ্য কর্ত্তব্য।

পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমে যখন শুভ দিনে বিদ্যা-রম্ভ করিয়া আমরা শিক্ষাগারে প্রবেশ হই। তখন শিক্ষা বিষয়ক কোন জ্ঞানই আমাদের হৃদয়ে উন্মেষিত হয় না, অনন্তর কৈশোর হইতে যৌবন পর্য্যন্ত কালই আমাদের প্রকৃত শিক্ষাকাল মধ্যে পরিগণিত। তারপর জীবন ময়ই তো শিক্ষা কাল থাকে। কিন্তু কৈশোর ও যৌবনময়কালই আমরা শিক্ষার জন সম্যক প্রকারে ন্যস্ত করিয়া থাকি। এ দিকে সেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধি সময় হইতে যৌবন-সময়ে মনে এক প্রকার স্বাভাবিক ভীষণ তমো ভাবের উদয় হয়। সে ভাব দুর্দ্দমনীয় যৌবনের প্রারম্ভ হইতে অতি বিমল বুদ্ধিও বর্ষার নদী জলের ন্যায় কলুষিত হইয়া পড়ে। নিত্য নূতন বিষয়-বাসনা ইন্দ্রিয়গ্রামকে তীব্র বেগে আক্রমণ করিতে থাকে। তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্ম সমূহকে ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ সম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। সুরা কি মাদক ব্যবহার না করিয়াই এক প্রকার মত্ততা বা অজ্ঞানতা উপস্থিত হয়, তদুপরি যাহাদিগের ধন-গরিমা আছে, তাহাদিগের অবস্থা সমধিক ভীষণ ভাব হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভয়াবহ সময়ে অহংকারের মাত্রা এতাধিক বর্দ্ধিত হয় যে, মানুষকে মানুষ জ্ঞান করিতে ইচ্ছা হয় না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান, গুণবান্, বুদ্ধিমান্ ও প্রধান বলিয়া মন-মাতঙ্গ নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত এই ভীষণ মত্ত মাতঙ্গের প্রবল অঙ্কুশাঘাতে ঔদ্ধত্য-প্রশমনার্থ আর্য্যগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি কঠোর সংযম ময় আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া সাংসারিক তামসিক লোক এবং প্রলোভন প্রভৃতি হইতে দূরে-গুরু গৃহে এই বিপদ সঙ্কুল সময়টা অতিবাহিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন তো সে সমস্ত উপকথায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এখন কার উপায় কি।

এখন ২৫ বর্ষ বয়স্ক যৌবনের ঔদ্ধত্যময় মধ্যমিকালীন যুবক নীতি ও ধর্ম্মবিহীন পাশ্চাত্য বিকৃত শিক্ষালাভে এম, এ, প্রভৃতি যত কিছু বিদ্যার উচ্চোপাধি মুখের জোরে হাকিম, উকীল, প্রফেসার বা যে কোন একটা অত্যুন্নত পদে অভিষিক্ত হইয়া অনেকে সবজান্দা সাজিয়াছেন। ইহারই ফলে এখন বিবাহ ক্রিয়া যথেচ্ছাচারে সম্পন্ন হইতেছে, তাহার পর ইহাদের যে সকল সন্তান জন্মাইতেছেন, সেই সন্তানগণই দেশের ভাবী ভরসা—এদিকে যৌবন, অর্থ, প্রভুত্ব এবং বিবেকবিহীনতা, যাহার একটীতেই রক্ষা নাই সেই চারিটাই তাঁহার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, ঈদৃশ ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বিষয়ক সদুপদেশ কোন শাস্ত্রে আছে ; তাহা ত আমরা খুজিয়া পাই না। তবে এখনও যাঁহারা সেই বিধর্ম্মী বিকৃত নীতিবিহীন ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা যদি কেহ কোন ভাগ্যবলে প্রাচ্য শাস্ত্রের উপদেশে আস্থাবান হইয়া আমাদের এ ক্ষুদ্রতম স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করেন, তবে তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ উপকারে ইহা আসিলেও আসিতে পারে।

মানবের প্রবৃত্তি দুই প্রকার। ১। সৎ-প্রবৃত্তি, ২। অসৎ প্রবৃত্তি। তন্মধ্যে সত্য, দম, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য, সৎসাহস, সন্তোষ, পরোপকার, অহিংসা, দক্ষতা, ন্যায়পরতা, বিনয়, নম্রতা ইত্যাদিকে সৎপ্রবৃত্তি বলেন। আর মিথ্যাচার, অসংযম, হিংসা, নৃশংসতা, ঔদ্ধত্য, অধৈর্য্য দুঃসাহস, অসন্তোষ, পরপীড়ন, অন্যায় আচরণ, আলস্য, অবিনয় আত্মম্ভরিতা প্রভৃতিকে অসৎ প্রবৃত্তি করে।

কর্ষণ ও যত্ন না করিলে যে কোন

ভূমিতেই স্বভাবতঃ আগাছা এবং নানাপ্রকার জঙ্গল উৎপন্ন হইয়া ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হয়, এবং সেই অরণ্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুগণ আবাস ভূমি করিয়া লয়। আবার উপযুক্ত কৃষক কর্ত্তৃক কর্ষিত ও পরিষ্কৃত হইলে সেই ভূমি অত্যুৎকৃষ্ট শস্য এবং সুস্বাদু ফলবান বৃক্ষ-রাজিতে পরিশোভিত ও জনগণের অশেষ কল্যাণদায়ক হইয়া থাকে। মানবদেহক্ষেত্রে ও সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা অভাবে অসৎ প্রবৃত্তিরূপ জঙ্গল উৎপন্ন হইয়া ভীষণ দুষ্কার্য্যরূপ হিংস্রক জন্তুগণের আবাস ভূমি হইয়া উঠে এবং তদ্দ্বারা সেই ক্ষেত্রই প্রথমে রোগ শোকাদি কণ্টকময় হয়, পরে তদ্দ্বারা তৎপার্শ্ববর্ত্তী জীবকুলেরও অনিষ্ট সাধিত হইতে থাকে। আবার উপযুক্ত শিক্ষকরূপ কৃষকের কর্ষণ এবং পরিষ্কারকরণের পর উৎকৃষ্ট সৎশিক্ষার বীজ রোপিত হইলে তাহাতে সৎপ্রবৃত্তিরূপ সুস্বাদু ফলবান বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ক্ষেত্রেরও স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তৎপার্শ্ববর্ত্তী জন গণেরও অশেষ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে।

"বিদ্যাতে বিনয় দান করে।" বিদ্বান হইয়াছেন কে? যাঁহার মানসিক সৎপ্রবৃত্তি সকল প্রসারিত হইয়া, অসৎ প্রবৃত্তিগুলি সংযমিত হইয়াছে, যিনি বিনয়ের আদর্শ হইয়াছেন, তিনিই বিদ্বান। এতদ্ভিন্ন সব অবিদ্বান। সৎপ্রবৃত্তিগুলি প্রসার লাভ করিলেই দেহে শান্তি, স্বাস্থ্য এবং কান্তি, শ্রী, পুষ্টি, প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। পক্ষান্তরে যাহার হৃদয়-ক্ষেত্র অসৎবৃত্তিরূপ আগাছায় পরিপূর্ণ; তিনি দশ পনরটা উপাধিতে মণ্ডিত লইয়া থাকিলেও তাঁহার হৃদয়ে শান্তি নাই, দেহ ও মনে রোগ শোকের অবধি নাই, দেহের কান্তি, শ্রী, পুষ্টি কিছুই নাই। সুতরাং তাহার জ্ঞানলাভ হয় নাই। আধুনিক শিক্ষায় তিনি নরাকারে পশু সদৃশ।

সমালোচনা।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর।

ইহা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন কথা। আমাদের সোদর প্রতিম সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক শ্রীমান নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। সাহিত্যপরিষদের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মীপুরুষ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পরলোক গমনের পর শ্রীমান নলিনীরঞ্জন যদি তাঁহার স্থান পূরণের ব্যবস্থা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মত আর এক জন ঐরূপ কর্ম্মী পুরুষ পাওয়া যাইত কি না বলিতে পারি না। শ্রীমান নলিনীরঞ্জন বড় লোক নহেন, – তাঁহার হাঁড়ির খবর আমরা সবই রাখি,—তিনি আমাদেরই মত সংসারের গুরু ভার লইয়া বিব্রত। সেই গুরুভার বহন করিয়া যিনি নিঃস্বার্থভাবে সাহিত্যপরিষদের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। তাহার উপর আবার মৃত সাহিত্যিকদিগের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহাদের জীবন কথা আলোচনার চেষ্টা করা—কম কথা নহে। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর আমাদিগকে তিনটী জিনিষ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি চিরস্মরণীয়। সে তিনটার একটী সাহিত্যপরিষদ, একটী সাহিত্য সম্মিলন, আর একটী সাহিত্যপরিষদের মন্দির। এ হেন রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন কথা—প্রত্যেক বাঙ্গালী সংসারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যদি শিক্ষালাভ না করে—তাহা হইলে বাঙ্গালীর জীবনই বৃথা, বাঙ্গালীকে অকৃতজ্ঞ বলিব। শ্রীমান নলিনী এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যিনি যত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সকল কথাই ইহাতে আছে, তা' ছাড়া সম্পাদকের নিজের মন্তব্যেও অনেক জ্ঞাতব্য কথা সন্নিবেশিত। পুস্তকের কাগজ, ছাপা, বাইণ্ডিং সকলই সুন্দর! মূল্য দুই টাকা মাত্র। প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরেই ইহা রক্ষিত হউক, শ্রীমান নলিনীরঞ্জন অন্যান্য পরলোকগত সুসাহিত্যিকদিগেরও জীবন কথা প্রকাশ করিয়া এইরূপভাবে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন—ইহাই আমাদিগের কামনা। ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট—বেঙ্গল বুক্ কোম্পানীর নিকট এই পুস্তক পাওয়া যায়।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
৩ ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৫ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৮—বৈশাখ। | ৮ম সংখ্যা।

গঙ্গাধর তর্পণ। *

[শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি, এ]

—:*:—

ভারতের শেষ যোগী ঋষিবর, আজিকে তোমায় হৃদয়ে স্মরি,
তব জ্ঞান হিম শৈল সানুতে ক্ষুদ্র আমরা মূরছি পড়ি।
এনেছি অর্ঘ্য ও নাম স্মরণে
হে মহাসিন্ধু, তোমার চরণে,
বেদ বেদাঙ্গ সঙ্গম ভূমি, হে বিরাট, তোমা কেমনে বরি।
ভারতের নব ধন্বন্তরি, আজিকে তোমারে প্রণাম করি।

যোগের রাজ্যে তুমি সম্রাট, ভোগের রাজ্যে ভিক্ষা মাগো,
বিশ্ব সুমেরু উত্তরি তুমি নিত্য ধ্রুবের আলোকে জাগো।
তোমার পাদুকা শতধা ভিন্ন
তৈল মলিন শয্যা ছিন্ন
আজি ফিরে পেলে হর্ষমত্ত নৃত্য করিগো শীর্ষে ধরি'—
চতুরাননের মানস পুত্র, আজিকে তোমারে চিত্তে স্মরি।

---

* শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় এখনকার দিনে কবিতা সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ। সকল মাসিক পত্রের মতই "আয়ুর্ব্বেদে"র পাঠকেরাও এখন হইতে ইঁহার কাব্য-সুধার আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইবেন। "গঙ্গাধর তর্পণে" "আয়ুর্ব্বেদে' তাঁহার তর্পণ আরম্ভ হইল।—আঃ সং

ওগো বিদ্রোহী সন্ন্যাসী বীর, ধূমকেতু সম তোমার কেতু।
প্রদ্যোতরাজ, খদ্যোত সম ঘুরি মোরা তব আরতি হেতু।
অধ্রুবে তুমি যজ্ঞে দহিয়া
ধ্রুবের আশীষ ললাটে বহিয়া
ব্রহ্মবিদ্যা পিপাসুরে দিলে অমৃত মন্ত্র নূতন করি,
জনগণ মাঝে পারমার্থিক, আর্য্য, তোমায় হৃদয়ে স্মরি'।

দাঁড়াও কালের বিজয়ী দ্বন্দ্বী, চির অনাময় মূর্ত্তিমান্!
সঞ্জীবনীতে ভৃঙ্গার ভরি' আর্ত্তে করিয়া অভয় দান।
একবার এসো স্থির স্যন্দনে,
তোমার পরশ হরি চন্দনে
তব দেশভরা কঙ্কাল কুলে ওজোরাগ রস রক্তে ভরি'
সত্যসন্ধ, মৃত্যুঞ্জয়, ভক্তিতে তোমা প্রণাম করি।

তব তপশ্ছটায় জ্বলজ্জটায় পাবন গঙ্গা অম্বু ঝরে,
জুড়াতে ত্রিতাপ দেহ আত্মার সন্তাপ হত সিনান করে।
ধ্বান্ত বিনাশী রুদ্র অনল
আঁখি হ'তে তব ছুটিল প্রবল
অনৃত ভণ্ড ভ্রান্তি দ্বন্দ্ব বিলাস জাড্য ব্যসন 'পরি।
রুদ্র শিবের পরম ভক্ত, অনঘ, তোমায় হৃদয়ে স্মরি।

বহিরন্তর দু'টি জীবনের মিলিত প্রয়াসে মোক্ষ মিলে
মুক্তি সহায় হয়নাক শুরু একটী জীবনে দীপ্তি দিলে।
দৈহিক আর মানস জীবনে
অনাময়ী সুধা নিতি বিতরণে—
রাখিতে শিখালে দীর্ঘ মিলন দু'টী জীবনেরি আর্ত্তি হরি।
সব্যসাচি হে, তোমার রথের রথ্যার পরে প্রণাম করি'।

গতানুগতিক জড়তা বিজয়ি, ওগো মনীষার কল্পতরু,
ছায়া ফলে ফুলে বিহগে ভূষিলে, তুষিলে তৃষিত উষর মরু।
তেজে ত্যাগে তুমি গাঙ্গেয়োপম,
সাধনায় দ্বৈ-পায়নের সম,
বজ্র কঠোর বাহ্যাবরণে পুষ্প পেলব চিত্ত ধরি।
অপাপবিদ্ধ হে লোকোত্তর চিত্ত, তোমায় আজিকে স্মরি।

করনিক' হীন আত্ম দেবেরে সন্নত করি পরের দ্বারে,
স্বীয় অন্তরে ব্রহ্ম যে জাগে প্রণম্য করি তুলেছ তারে।
পরপ্রত্যয় নমে চারি পাশে
স্বতঃ প্রবুদ্ধ তব জ্ঞান হাসে,
তুমি কাঞ্চনজঙ্ঘা সমান ভ্রমের অভ্র বিভাগ করি'।
বঙ্গের জ্ঞান নভে ভাস্বর—ভাস্কর তোমা চিত্তে স্মরি।

স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুলাভের উপায় *

[ডাঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ]

মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য চতুর্ব্বর্গলাভ, শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি চতুর্ব্বর্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক এই চারিটি প্রাপ্ত হইলে মানবের আর কিছু পাইতে বাকী থাকে না এবং এই চতুর্ব্বর্গ ভিন্ন মানবজীবনে, আর কিছু বাঞ্ছনীয়ও নাই, কিন্তু চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে হইলে স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা নিতান্তই আবশ্যক, অসুস্থ শরীরে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না, স্বাস্থ্যের সহিত দীর্ঘজীবনেরও অতি নিকট সম্বন্ধ। স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিতে পারিলেই দীর্ঘায়ুও মন্ত্রাহত সর্পের ন্যায় করায়ত্ত হইয়া যায়।

জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুখ কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা অনেকে করিয়াছেন,—"ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" সুতরাং নানামুনি নানা মত প্রচার করিবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তবুও উত্তম স্বাস্থ্যই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুখ বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সার জিল্‌বার্ট পার্কার, মিস্ মেরী ষ্ট্যাঙ্কে, মিঃ ফ্রেড্ টেরী প্রভৃতি এই মতের ঘোর পক্ষপাতী।

* নদীয়া, হরিপুরের "সারস্বত ভবনের" ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে পদক পুরস্কারের প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধ।

ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া দুর্ব্বিসহ জীবনভার বহন জীবন্তে নরকভোগের সমান, সেই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, "রুগ্ন দেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকাই মৃত্যু এবং মরণই রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ হিতকর।" এক সময়ে কোন ভগ্নস্বাস্থ্য নরপতি এক হৃষ্টপুষ্ট ভিখারীকে দেখিয়া নিজের জীবনকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন—"হায়, আমার অপেক্ষা এই ভিখারীর জীবন শতগুণে শ্রেষ্ঠ।" বাস্তবিক রুগ্নব্যক্তির নিকটে সুখসৌন্দর্য্যপূর্ণ সংসারই বিষের উৎস বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, সত্যকালে মানবের পরমায়ু লক্ষবর্ষ পরিমিত ছিল— "নরাণাম্ লক্ষবর্ষ পরিমিতং পরমায়ুঃ।" ত্রেতাযুগের পরমায়ু দশসহস্র বর্ষ পরিমিত দ্বাপরের সহস্র বর্ষ পরিমিত, কিন্তু কলিকালে মানবের পরমায়ু মাত্র একশত বিশ বৎসর।" সত্য। ত্রেতাদিযুগে বাস্তবিক মানব লক্ষবর্ষ, দশসহস্র অথবা ঐরূপ দীর্ঘজীবন ভোগ করিত কি না কিম্বা এরূপ উপাখ্যান আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কিনা—সে বিচারের কোন প্রয়োজন আমাদের নাই, কিন্তু সর্ব্বদেশের শাস্ত্র ও ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—পূর্ব্বকালের মানব অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন, কালক্রমে নানা ভাবে তাহাদের অধঃপতন ঘটিয়াছে, খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম পুস্তক বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদিপুরুষ আদমের বয়ক্রম ৯৩০ বৎসর ছিল, তাঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ মথুশেলহের বয়স ৯৬৯ বৎসর ছিল, কিন্তু তাঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ নাহোর মাত্র ১৪৮ বৎসর জীবিত ছিলেন।

যাহা হউক কলিযুগে যে একশত বিংশতি বর্ষ পরমায়ুর উল্লেখ আছে, তাহাও দুই এক পুরুষ পূর্ব্বেকার মানবের মধ্যে দেখা যাইত। এখনকার মানবের পরমায়ু গড়ে ২৩। পঞ্চাশের কোটা উত্তীর্ণ না হইতেই যমরাজার আদালত হইতে শতকরা ৯৯জনের চরমডাক আসিয়া উপস্থিত হয়। আজকাল অকালমৃত্যুর সংখ্যা যে কত বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বাঙ্গালী জাতি মরণের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার ধ্বংসকার্য্যও অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতেছে, প্রতি দশ বৎসর অন্তর গবর্ণমেণ্টের যে আদমসুমারী বা লোক গণনা হয় তাহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালী জাতির জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার ফলে, সেই মুনিঋষিদের বিরাট জাতি, যে কত ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া জগতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে আপনার নাম খোদিত রাখিয়া আসিয়াছে, সে আর কিছুদিনের মধ্যে একেবারেই লুপ্ত হইয়া যাইবে। আমাদের পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতির সময়ে মানব স্বাস্থ্য এবং সুখের পূর্ণ অধিকারী হইয়া দীর্ঘজীবনভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনেকে অশিক্ষিত বর্ব্বর বলিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, অথচ তাঁহাদেরই বংশধর আমরা—আমরা সভ্য ও শিক্ষিত হইয়াও চিররুগ্ন; নিতান্ত নিঃসহায়ের ন্যায় অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছি। আমাদের জাতি যে ক্রমাগত ধ্বংসোন্মুখী হইতেছে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াও আমরা তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারিতেছি না।

কেন এরূপ হইল, সোণার বাঙ্গালার সোণার সংসারে কেন এমন করিয়া আগুণ লাগিল? ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের তৎকালোচিত জীবনযাত্রার প্রণালী আলোচনা করায় বিশেষ প্রয়োজন হয়।

সে কালে রেল-ষ্টীমারের চলন ছিল না, দেশের খাদ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হইত না, পক্ষান্তরে সম্পদশালী ইংরাজ প্রভৃতি জাতির নানাবিধ বিলাস সামগ্রীও বঙ্গপল্লীর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইত না। বিংশ শতাব্দীর সহরের সহিত তখনকার মানব পরিচিত ছিল না, ক্ষেত্রের উর্ব্বরাশক্তিও যথেষ্ট ছিল, সুতরাং কাহারও কোন অভাব ছিল না, বঙ্গজননীর দান—মোটা ভাত, মোটা কাপড় তখনকার লোকে হৃষ্টচিত্তে মাথা পাতিয়া লইত। আহারবিহারের কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটিলে এবং মনে যদি পূর্ণশান্তি বিরাজ করে, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবার কোন হেতু দেখা যায় না, এই সমস্ত কারণেই সেকালের মানবগণ পূর্ণস্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করিতেন। একালের ন্যায় তখন এত ব্যাধিরও প্রাচুর্য্য ছিল না, একথা বোধ হয় মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করা যাইতে পারে।

দেবতুল্য মুনিঋষিগণের জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যালব্ধ উপদেশ সমূহ তখনকার মানবগণ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন, ইহাও তাঁহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। কালপ্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে আমরা আজ সেই সমস্ত উপদেশ বাতুলের প্রলাপ বলিয়া মনে করি। ইহা যে আমাদের কত বড় নৈতিক অধোগতির ফল তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। অমাবস্যায় মৎস্য মাংস ভক্ষণ অথবা স্ত্রীসম্ভোগ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এরূপ আচরণে আয়ুক্ষয় হয়। কেন হয় সে কথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। যদি কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেও অনেকে বুঝিবেন না, কারণ এই সমস্ত বিষয় বুঝিতে গেলেই জ্ঞানী হইতে হয়, কিন্তু সংসারে প্রকৃত জ্ঞানী কয়জন হইতে পারেন? পিতা, পুত্রকে অনুচিত কার্য্যে বাধা দিয়া থাকেন, বালক কার্য্যের ইষ্টানিষ্ট বুঝে না, কিন্তু গুরুজনের আজ্ঞা পালন করা উচিত বলিয়াই সুবোধ বালক পিতার উপদেশ মানিয়া চলে। আমাদেরই মঙ্গলের জন্য মুনিঋষিগণ যে সমস্ত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সুবোধ বালকেরই ন্যায় আমাদেরও তাহা পালন করা উচিত।

পূর্ব্বকালে ব্যাধির প্রাচুর্য্য ছিল না এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে সব দিনের কথা আজ "নিশার স্বপনের" ন্যায় মনে হয়। কালপ্রভাবে ইদানীং নানাবিধ ব্যাধির বীজাণু আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে কোন কারণে যাহাদের জীবনীশক্তি (vital power) হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত মানবকেই এই বীজাণু শিকাররূপে পাইয়া বসে। যাহা হউক এই রোগ-বীজাণু আজ সর্ব্বদেশেই অল্লাধিক পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের সহিত বাঙ্গালীর জন্মমৃত্যুর হার তুলনা করিয়া দেখিতে পাই, বাঙ্গালীর ন্যায় অন্য কোন জাতি এমন অসহায়ের মত নানাব্যাধির শিকাররূপে ক্রমাগত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় না, এখানে একটিমাত্র

উদাহরণ দিলেই এ বিষয় সুস্পষ্ট হইবে আশা করি। গত ১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা বিকট রাক্ষসীর ন্যায় সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবাসী যেমন অবলীলাক্রমে তাহার কবকবলিত হইয়াছিল এমন আর কোন জাতি হয় নাই। ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের লোকসংখ্যা ৫ কোটী ৫০ লক্ষ। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার মরিয়াছে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ৩১ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৬০ লক্ষই ইনফ্লুয়েঞ্জা রাক্ষসীর হস্তে নিহত হইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতবর্ষে ৫০ লক্ষের উপর লোক বেশী মরিয়াছে। ঐ বৎসর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার এক লক্ষেরও উপর ছিল। কি ভয়ঙ্কর শোচনীয় অবস্থা!

ব্যাধির বীজাণু অণুপরমাণুরূপে জগতের সর্ব্বত্রই বিরাজিত। অথচ এক একটী সংক্রামক ব্যাধি ভারতবাসীকে অবলীলাক্রমে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যায়, উপযুক্ত খাদ্যাভাবই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ এবং একথা ধ্রুব সত্য যে, একটা জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তাহার সম্পূর্ণ বিনাশ হইতেও বেশী দেরী লাগে না। বলা বাহুল্য ভারতবাসীতে এই কারণ সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তিয়াছে। বঙ্গদেশের স্যানিটারী কমিশনার স্বয়ং ডাক্তার বেন্টলীকেও একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের জন্মভূমি 'সুজলা সুফলা শ্যামা"—অথচ উপযুক্ত খাদ্যাভাবে আমাদের জীবনীশক্তি ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। আমাদের স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমেই খাদ্যাভাবকে দূর করিতে হইবে।

শরীর ধারণোপযোগী যে সমস্ত খাদ্যের প্রয়োজন, আজকাল আমরা তাহা সম্পূর্ণরূপে পাই না, নানা কারণে ভারতবাসী আজ অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এমন সে পূর্ব্বে কোনদিন ছিলনা, পূর্ব্বেকার ভারত ধনধান্যে পূর্ণ ছিল, আজ অনেকেই দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে বিলাসিতার স্রোতে সকলেই ভাসিয়া চলিয়াছি, একবেলা অন্ন জুটাইবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু ভাল জামা জুতা কাপড় না হইলে আমরা গৃহের বাহির হইতে পারি না! এইরূপ বিলাসিতার জন্য আজ আমরা সত্য সত্যই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছি।

দারিদ্র্যসমস্যা বড় বিষম সমস্যা, এ সমস্যার মীমাংসা সহজে হইবার নহে, কিন্তু চেষ্টার অসাধ্যও কোন কার্য্য নাই, তাহাই মনে করিয়া আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। দরিদ্রের বিলাসিতারূপ "ঘোড়া রোগ" নিতান্তই অশোভন, সর্ব্বাগ্রে এই বিলাসিতাকে বর্জ্জন করিতে হইবে, খাদ্য কৃত্রিমতা স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। আজকাল অকৃত্রিম খাদ্য নিতান্তই দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় মৎস্য পাওয়া যায় না, দুগ্ধে নানারূপ কৃত্রিমতা দেখা যায়; খাঁটি গব্যঘৃত আজকাল কোথায়ও পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "ঘৃতং আয়ুঃ"—পবিত্র গব্যঘৃতই শ্রেষ্ঠ রসায়ন, পূর্ব্বকালে প্রতিগৃহেই অতি যত্নের সহিত গোপালন হইত, পূর্ব্বকালের হিন্দুগণ অকৃত্রিম ভক্তিসহ পয়স্বিনী গাভীকে ভগবতী জ্ঞানে পূজা করিতেন, পূজায় তুষ্ট হইয়া প্রতিদানরূপে ভগবতীও প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ

দিতেন, প্রতিগৃহে সেই দুগ্ধ হইতেই ঘৃত মাখন প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যাদি প্রস্তুত হইত, পল্লীর বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়—যেদিন তাঁহারা ঘৃত জ্বাল দিতেন, সেদিন তাহার সুগন্ধে পল্লী আমোদিত হইত। ইহা খাঁটি সত্য কথা;—অথচ আজ আমাদের কাছে রূপকথাই ন্যায় মনে হয়।

যেদিন যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। বাঙ্গালার সে অতীত সুখের দিন বুঝি চিরদিনের জন্যই ঘোর অমার আঁধারে মিশিয়া গিয়াছে, তাই অতীতের সে সহজ-লভ্য পুষ্টিকর খাদ্য-প্রাচুর্য্যের সন্ধান সহজে পাইবারও বুঝি কোন উপায় নাই, সেইজন্য আজ আমাদের বর্ত্তমান খাদ্য প্রণালীর বিশ্লেষণ সর্ব্বত্রই আলোচিত হইতেছে।

শরীর ধারণোপযোগী আমাদের কি কি উপাদান যুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন এবং কোন্ উপাদান কত পরিমাণে দরকার আজ প্রত্যেক স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিই তাহার আলোচনায় উদ্-গ্রীব। উপাদান অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণ করা সুকঠিন, এবং এ সম্বন্ধে কোন নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়াও সম্ভবপর নহে, কারণ খাদ্যের পরিমাণ মানবের প্রকৃতি, বয়স, দৈনিক কার্য্যের পরিমাণ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে, তবে তাহার একটা সাধারণ জ্ঞান আয়ত্ত থাকিলে প্রায়ই বিপথে যাইবার সম্ভাবনা থাকে না, সেই হেতু এখানে খাদ্যের উপাদা-নীয় বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

খাদ্যে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকারের উপাদান বা সার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ও শরীর ধারণের জন্য এই পাঁচ প্রকারের পদার্থই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

১। ছানাজাতীয় উপাদান (Protid) ২। শর্করা জাতীয় (Carbohydrate) ৩। মাখনজাতীয় (Fat) ৪। লবণ জাতীয় (Mineral Salt) ৫। জল (Water)।

আমাদের দেহের অস্থি, মাংস, চর্ব্বি, রক্ত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক (compound) পদার্থরূপ উপকরণ দ্বারা গঠিত, পক্ষান্তরে এই সমস্ত যৌগিক পদার্থই কতকগুলি মৌলিক (elements) পদার্থের রাসায়নিক সম্মিলন মাত্র; অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, কার্ব্বণ, গন্ধক, ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ দেহের অস্থি-মাংস প্রভৃতি যৌগিক পদার্থগুলি ১৬টী মৌলিক পদার্থের সম্মিলনে নির্ম্মিত হইয়াছে।

দেহ হইতে নিয়তই উপকরণ সমূহ ক্ষয় পাইতেছে, খাদ্যের দ্বারা সেই ক্ষয়ের পূরণ হয়, অথচ প্রত্যেক উপাদানের খাদ্যেই যে প্রয়োজনীয় ১৬টী মূল পদার্থ (elements) আছে, তাহা নহে, যেমন মাংসপেশীর মধ্যে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্ব্বণ ও সালফার আছে; অস্থির মধ্যে এই কয়েকটি ত আছেই, উপরন্তু ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস্ আছে, আবার চর্ব্বির মধ্যে কেবলমাত্র হাইড্রজেন, অক্সিজেন ও কার্ব্বণ আছে ইত্যাদি। সেই জন্যই আমাদের নানাবিধ উপাদানের খাদ্য গ্রহণের দরকার হয়।

১। ছানা জাতীয় উপাদান (protid), এই উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন আছে, সুতরাং নাইট্রোজেনযুক্ত মাংসপেশী প্রভৃতির পুষ্টিসাধন ও ক্ষয় পূরণই ইহার কার্য্য, সেই জন্যই ছানা জাতীয় খাদ্যের অপর নাম **flesh former** বা মাংসগঠক হইয়াছে, খাদ্যের মধ্যে

ছানা জাতীয় উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে না থাকিলে দেহও সম্যক পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য। মৎস্তে ইহার পরিমাণ শতকরা ১২, মাংসে ২১, ডিম্বে ২২, দুগ্ধে ৪ কিন্তু দাইলে সব চেয়ে বেশী ২৩ ভাগ প্রোটিড আছে।

২। শর্করা জাতীয় উপাদান (carbo-hydrate) ইহার মধ্যে অক্‌সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বণ আছে, কিন্তু নাইট্রোজেন নাই সুতরাং ইহার দ্বারা প্রোটিডের ন্যায় মাংস-গঠন বা ক্ষয়পূরণ হয় না; ইহার কার্য্য দৈহিক উত্তাপ উৎপন্ন করা ও কার্য্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি করা, কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পদার্থ যেরূপ বায়ুস্থিত অক্‌সিজেনের সহিত মিশিয়া দগ্ধ হয় এবং তাপ ও কার্ব্বণিক এসিড্‌ উৎপন্ন করে, সেই রূপ এই কার্ব্বহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যও দেহ মধ্যে অক্‌সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয় ও তাপ উৎপন্ন করে, তাহারই ফলে আমরা কার্য্য করিবার শক্তি প্রাপ্ত হই, এই তাপের জন্য ঠিক ইঞ্জিনের ন্যায় আমাদের দেহযন্ত্রটী চলিতেছে।

৩। মাখন জাতীয় উপাদান (fat) এই জাতীয় খাদ্যও শর্করা জাতীয়ের ন্যায় দৈহিক তাপ উৎপন্ন ও কার্য্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি করে, শর্করা জাতীয় অপেক্ষা মাখন জাতীয় খাদ্যই অধিক তাপ উৎপন্ন করে, কিন্তু শর্করা জাতীয় অপেক্ষাকৃত সহজে ও শীঘ্র দগ্ধ হয় এবং আমরা তাপ ও শক্তির জন্য শর্করা জাতীয়ের উপরই বেশী নির্ভর করি।

অধিক পরিশ্রমের কার্য্যে শর্করা ও মাখন জাতীয় খাদ্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

৪। লবণ জাতীয় (Salts), প্রোটিডের ন্যায় ইহাও শরীর গঠনের সহায়তা করে, অস্থির গঠনে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট (Calcium Phospate) পাকস্থলীস্থিত পাচক রস (Gastric juice) তৈয়ার করিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড (বা সাধারণ লবণ) রক্তের ক্ষার-ভাব সম্পাদনের জন্য নানাবিধ ক্ষারঘটিত লবণ প্রভৃতির প্রয়োজন।

৫। জল (wate) রক্তকে তরল অবস্থায় রাখিয়া রক্ত চলাচলের (circulation) সহায়তা করে, খাদ্য পরিপাকের সহায়তা করে এবং পরিপাক প্রাপ্ত খাদ্যকে তরল করিয়া রক্তের সহিত মিশাইবার সুবিধা করিয়া দেয়, জল এবং লবণের সাহায্যেই প্রোটিড্‌ শরীর গঠন করিতে সমর্থ হয়। ইহা ভিন্ন জল শরীরের সকল প্রকার দূষিত পদার্থ মলমূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদির আকারে নির্গত করিয়া দেয়।

খাদ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে দেশ কালপাত্র বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালীকে সহরের বিলাসব্যসন ত্যাগ করিয়া সাধ্যানুসারে পুনরায় পল্লীমাতার ছিন্ন আঁচল আশ্রয় করিতে হইবে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকেও সেইরূপ জীবন যাপন করিতে হইবে, কৃষির উন্নতি বিধান করিতে হইবে, ক্ষেত্রে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে ধান, কলাই, সরিষা প্রভৃতি নিত্যাবশ্যক শস্য জন্মে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাজারের চর্ব্বিমিশ্রিত, ঘৃতে আমাদের স্বাস্থ্য কিছুতেই অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, পুনরায় গৃহে গৃহে পয়স্বিনী গাভীর আবির্ভাব যাহাতে

হয়—তাহা করিতে হইবে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেরই ন্যায় ঠিক ভগবতী জ্ঞানে তাহাদিগকে পূজা করিতে হইবে, তাহাদের চরিবার জন্য উন্মুক্ত প্রশস্ত ময়দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যে সমস্ত গাভী উন্মুক্ত ময়দানে চরিতে পায় না—সর্ব্বদাই একস্থানে বদ্ধ থাকে—তাহাদের দুগ্ধ কখনই স্বাস্থ্যকর হয় না, দুগ্ধের বহুবিধ গুণের উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যহ দুগ্ধ সেবন করিলে জরা ও যাবতীয় রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে, শরীর ধারণোপযোগী পঞ্চবিধ উপাদানই একমাত্র দুগ্ধে বর্ত্তমান।

আমাদের বর্ত্তমান আহার প্রণালীও স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে, সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগেই রাজার জাতির নিয়ম-কানুন দেশমধ্যে বলবত্তাবে প্রচলিত হয়, তাহার ফলে আমাদের পূর্ব্বের সনাতন রীতি উঠিয়া গিয়াছে, ইস্কুল-কলেজ আফিস প্রভৃতি যে নিয়মাধীনে চলিতেছে, তাহাতে আমাদিগকে ত্বরান্বিত হইয়া নাকেমুখে ভাত গুঁজিয়া দৌড়াইতে হয়, আহারের পরে একটু বিশ্রামেরও অবসর থাকে না সুতরাং অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্তশূল প্রভৃতি ব্যাধিদ্বারা আমরা অতি শীঘ্রই আক্রান্ত হইয়া পড়ি। ফলতঃ এই সমস্ত ব্যাধি আমরণ আমাদের সঙ্গের সাথী হইয়াই থাকে, দেশের অধিকাংশ জমিদার-কাছারী প্রভৃতিতে এখনও পূর্ব্বেকার রীতি প্রচলিত থাকিলেও বড়ই দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য সভ্যতা-মুগ্ধ অনেক জমিদার বিদেশীয় রীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

ত্রিধাতু ও আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিকতা।

[ডাঃ শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ]

"আয়ুর্ব্বেদ" পত্র,—তুমি আজ মহর্ষি অথর্ব্বণের মুখ নিঃসৃত আয়ুর্বিজ্ঞানকে পাশ্চাত্যভাবমুগ্ধ ভারতের গৃহে গৃহে প্রচার করিতে বসিয়াছ, তাই আজ তোমার নিকট তাহারি ধ্রুব সত্যতামূলক আলোচনা লইয়া উপস্থিত হইলাম; তুমিই ভরসা,—তুমিই সহায়।

এই হিমকুণ্ডলা বারিধী মেখলা ভারত· তুমি ঋষিশাসিত দেশ। সময় বৈগুণ্যে আজ ইহা পাশ্চাত্যের অনুশাসিত। ভারতের যাহা চির গৌরবের এবং চিরশ্লাঘার, আজ তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শে পরিচালিত। এই দেশের বর্ত্তমান আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ক্রিয়া-কর্ম্ম—এমন কি বাকভঙ্গী পর্য্যন্ত ইউরোপ হইতে আমদানি। ইহার জন্য ক্ষোভ করিবার—আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। আবার থাকিলেও কোন লাভ নাই—ফল নাই কেননা বর্ত্তমানে ভারতের প্রধান শিক্ষা পাশ্চাত্য বিদ্যা এবং সভ্যতা। মাথাটা পাশ্চাত্যভাবে একেবারে ভরপুর!

এই কুহকী শিক্ষায় ভারতের একটি মহা গৌরবময় মানবজাতির আদিজ্ঞান ভাণ্ডার-জাত বেদসম্মত প্রথা বা শিক্ষার উপর প্রায়

অনুমান ৩০ বর্ষ হইতে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের এবং তদীয় ভারতীয় শিষ্যগণের যে ভ্রান্ত কুধারণা জন্মিয়াছে, তাহারি সাধ্য অনুযায়ী আলোচনা জন্য অত্র এই প্রবন্ধের অবতারণা।

অতি দুঃখের কথা যে, এই দেশীয় শিক্ষিত কতিপয় ব্যক্তির মস্তিষ্ক উক্ত কুধারণার প্রতিপোষকতা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। চির সত্য বিজ্ঞান সম্মত আয়ুর্ব্বেদীয় মতকে অবৈজ্ঞানিক হাতুড়িয়া মত বলিয়া যে প্রচারিত হইতেছে—ইহার প্রতিকূলে ভারতীয় উর্ব্বর মস্তিষ্কগুলি কেন যে অদ্যাপি পরিচালিত নহে --ইহা এই ঋষি শাসিত আর্য্য ভূমির কলঙ্ক নহে কি?

বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শনৈঃ শনৈঃ ক্রমিক উন্নতি দেখিয়া ভারত প্রবাসী বৈদেশিক ডাক্তারগণ এই উন্নতির প্রতিরোধ করিতে একেবারে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। বহুস্থানে উক্ত মহাত্মাগণ এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া, বড় বড় সভায় গণ্যমান্য লোকের নিকট বক্তৃতা করিয়া সহানুভূতির তরল হৃদয়ে বলিতেছেন যে—"আয়ুর্ব্বেদ পূর্ণ হাতুড়িয়া পদ্ধতি। ইহার বায়ু পিত্ত কফ মূলক প্যাথলজি (নিদান তত্ত্ব) সম্পূর্ণ উপহাসের ব্যাপার। বুঝিতে পারিনা যে, এই দেশীয় বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেমন করিয়া এই হাতুড়িয়া চিকিৎসার উপর স্নেহের পুত্তলী পুত্র কন্যাগণের এবং নিজেদের অমূল্য জীবনের, ব্যাধি প্রতিকার ভার নির্ভর করেন।" এমনকি, উক্ত শ্বেতমহাত্মাগণ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, "দালালের বাক্ ভঙ্গীতে এবং কতিপয় চটকসই ছদ্মবেশী কবিরাজের বিজ্ঞাপন কুহকে মুগ্ধ হইয়া কাউন্সিলের সভ্যগণ, বড় বড় রাজা মহারাজাগণ, কলেজের প্রফেসারগণ, উকিল ব্যারিষ্টারগণ ও শিক্ষিত ধনী মহাজনগণ জীবনটাকে একটা খেলার বস্তুর ন্যায় আয়ুর্ব্বেদের উপর নির্ভর করেন কিরূপে? ইহাতে ভারতবাসিগণ পূর্ণ ক্ষতি গ্রস্থ হইতেছেন। অসভ্য ভীল সাঁওতাল দিগের ন্যায় জীবনটিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছেন। ইত্যাদি—ইত্যাদি"। এই প্রসঙ্গে আবার অল্পদিন হইল মান্দ্রাজের লাট কাউনসিলে আইন দ্বারায় যাহাতে এই আয়ুর্ব্বেদ ভারত হইতে উঠিয়া যায় তাহার প্রস্তাব করিতেও তাঁহারা ছাড়িতেছেন না। কার্য্যেও তাঁহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু হায়! অতি দুঃখের কথা এই যে, এই প্রসঙ্গে এই দেশীয় দুই চারিজন শিক্ষিত ডাক্তার তাঁহাদের পিতৃপিতামহের অনুষ্ঠিত ত্রিকালদর্শী ঋষি মস্তিষ্কজাত পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, প্রত্যক্ষসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক হাতুড়িয়া পদ্ধতি বলিয়া প্রবন্ধ পাঠ এবং বক্তৃতায় নিজ নিজ নির্লজ্জ মত প্রকাশ করিতে ও কুণ্ঠিত নহেন। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার দ্বিতীয় আছে কি?

বৈদেশিক মহাশয়গণ এখন দেখিতেছি ভারতের রাষ্ট্রশক্তি লইয়া এই দেশের সামাজিক, ব্যবহারিক নৈতিক এবং পারত্রিক মতকে পর্য্যন্ত স্বকীয় তামসিক মস্তিষ্কের অনুকরণে পরিচালিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিতেছেন। ইহাকে আত্মম্ভরিতা মিশ্রিত অজ্ঞতা ভিন্ন নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় আর কি আখ্যা দিবেন? ইহারা সভ্যতা গর্ব্বে এতই আত্মবিহ্বল যে, জগতের আদি সভ্য আর্য্য জাতির উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত ধর্ম্ম বিজ্ঞানকে

পর্য্যন্ত বিকৃত ভাবে বুঝিয়া বিকৃত মত প্রচার করিতেও ছাড়িতেছেন না। সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাই ইহার মুখ্যকারণ। উদাহরণ স্বরূপ মোক্ষমুলারের ঋগ্বেদানুবাদ আর জষ্টিস্ উডরফের তন্ত্র প্রকাশ উল্লেখ যোগ্য। এই সকল মহাত্মাগণ যাহা করণীয় তাহা করিতেছেন, ইহাতে অধীন জাতি আমাদের দ্বিরুক্তি করিয়া লাভ নাই। কেন না ভাগ্যের দেশ জাতি-বিশেষের মার্জ্জিত সুলভ চক্ষের ইঙ্গীতে সর্ব্বরূপ ভাবে পরিচালিত। ইহা ভগবানের লীলা। ক্ষোভের কথা এই যে, যদি এদেশীয় শিক্ষিত ডাক্তারগণ আয়ুর্ব্বেদের বায়ু পিত্ত কফের নিদানভূত প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মতটিকে একটুকু ধীর স্থির চিত্তে আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে আর আজ আইন সভায় আয়ুর্ব্বেদের মুণ্ডপাত হইত না, প্রকৃত সত্য বাহির হইত। পাশ্চাত্য ডাক্তারগণও ঢাক বাজাইতে পারিতেন না। এমন এক দিন ছিল—যেদিনে আয়ুর্ব্বেদের এই অভ্রান্ত মতকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে কেহ সাহসও করিত না। দুঃখের কথা—"তেহিন দিবস গতা"।

স্মরণাতীর্ত কাল হইতে বৃটিশ শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ ভারতের চিকিৎসা ক্ষেত্রে একচ্ছত্র সম্রাট ছিল। মধ্য সময়ে ইসলাম-প্রধান্যকালে হকিমি পদ্ধতি আরবীয় পণ্ডিতগণের আয়ুর্ব্বেদ অভিজ্ঞানের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফল। দেশ যখন পাশ্চাত্য জাতির অবাধ সমাগমে এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে পরিচালিত হইতে লাগিল, তখন নিত্য নূতন ব্যাধির প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইল। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে যখন সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিতে জনপদ-বিধ্বংসী ম্যালেরিয়া রাক্ষসী দেশ উদরসাৎ করিতে আরম্ভ করিল—তখন তাহা দমন জন্য কুইনাইন নামক শতঘ্নী দেশে আসিয়া জলদনির্ঘোষে ভারত মাতাইয়া তুলিল। এই নবাগত কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধের ক্রিয়া দেখিয়া এই দেশবাসীর ডাক্তারী চিকিৎসার উপর ভক্তি আর আদর বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ধীর—স্থির স্থায়ী গুণশালী আয়ুর্ব্বেদীয় প্রথার উপর অনেকটা অনাদর—অনেকটা শিথিল ভাব জন্মিতে লাগিল।

এই সময় কলিকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ডাক্তারি চিকিৎসা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সুতরাং এই সমস্ত কারণে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত হইল। বলিতে কি, এই সময় বহু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের সমালোচনা আর ইংরেজী অনুবাদ পর্য্যন্ত বাহির হইল। বলা বাহুল্য এই কার্য্য এই দেশীয় ডাক্তারগণেরই কৃত। স্মরণ হয় যেন ডাক্তার উদয়চন্দ্র দত্ত "হিন্দু মেটিরিয়া মেডিকা" নাম দিয়া একখানি বৃহদাকার ইংরেজী আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সর্ব্ব প্রথমে বাহির করেন। এই মহাত্মাই সর্ব্ব প্রথমে আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক হাতুড়িয়া পদ্ধতি বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহারি তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে আয়ুর্ব্বেদের বায়ু, পিত্ত, কফের (প্যাথলজি) নিদান তত্ত্বকে এবং থিরেপিউটিকসকে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক মত বলিয়া প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে দত্ত মহাশয়ের কীর্ত্তি আর আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা বিস্তৃতি লাভ করে। বলিতে কি এই সময় হইতেই আয়ুর্ব্বেদের বায়ু পিত্ত কফ ডাক্তার দিগের নিকট "এয়ার বাওয়ল আর ফেলেগাম" বলিয়া পরিচিত হয়। এই অযথা

ধুয়াই আয়ুর্ব্বেদের অবৈজ্ঞানিকত্ব প্রচারের মূল সূত্র এবং প্রথম আলোচনা। আক্ষেপের কথা এই যে, মনুষ্য জীবনযন্ত্র পরিচালনের মূল বায়ু পিত্ত কফ যে ডাক্তারি এয়ার বালগম এবং বাওয়ল নহে—ইহা উদয় চাঁদ প্রমুখ শিক্ষিত ডাক্তারগণ বুঝিতে তো পারিলেনই না, প্রত্যুতঃ পরের মুখে ঝাল খাইয়া পিতৃপিতা-মহকে অজ্ঞান মূর্খ প্রতিপন্ন করিতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না।

এই অযথা অজ্ঞতা দেশময় প্রসারিত হইয়া বৈদেশিক ডাক্তারগণের গুপ্ত উদ্দেশ্যকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। কিন্তু বিধির কলম ভিন্ন পথে চলিল; ডাক্তারি পড়িয়া উদয় চাঁদ প্রমুখ ডাক্তারগণ যেমন বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মাকে মলরূপী অবৈজ্ঞানিক বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমন্বয়" নামক গ্রন্থে এই দেশীয় একজন শিক্ষিত ডাক্তার উক্ত মতকে অসার প্রতিপন্ন করিয়া জলদ নির্ঘোষে সভ্য জাতিকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এখানে কতিপয় ডাক্তার পূর্ব্বের ভ্রান্ত অজ্ঞতাকে বিস্মরণ হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ডাক্তারী —Corletiree funghon আর Sustenti-ne funghan ও genarrtew funghoeকে বায়ু পিত্ত কফ রূপ ত্রিধাতুর সহিত একতা প্রমাণ করিতে বাইওলজি ফিলসফির মূল ভিত্তিস্বরূপ দাঁড় করাইতে পারিলে আর বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদের মত বিজ্ঞান সম্মত নহে —ইহা বলিতে কেহ সাহস করিবেন না। এই গভীর তত্ত্বকে সুন্দররূপে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, আয়ুর্ব্বেদের বায়ু সাধারণ এটামসফেয়ারিক ভূ বায়ু নহে। উহা ডাক্তারি বাইওলজি ফিলোসফির করোলেটিভ কাংসনের সহিত তুল্যার্থবোধক জীবনযন্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিয়া। আয়ুর্ব্বেদের দ্বিতীয় ধাতু পিত্ত ডাক্তারি এনারেলিক এবং ক্যাটাবোলিক এনাবোলিজিয়মের সহিত সমান গত্যর্থবোধক শক্তি। বস্তুতঃ যে স্থানে গতি সেই স্থানেই বায়ু ক্রিয়াশীল। ইহা প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় দেশীয় পণ্ডিতগণের মত। এদিকে আবার মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন— "বায়ুস্তন্ত্র যন্ত্রধরঃ প্রবর্ত্তক সর্ব্বচেষ্টা নাম" বাহির বায়ু গতির ন্যায় আমরা পরমাণুর সংযোগ বিযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া স্পন্দন, রক্তসঞ্চালন, আকুঞ্চন প্রসারণ নিঃশ্বাসের উত্থান-পতন, মলমূত্র নিঃসরণ, কণ্ঠনলীর আকুঞ্চন-প্রসারণ, কথন-ক্রিয়া প্রভৃতি জীবদেহের সর্ব্বত্রই বায়ুর জলন্ত প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান ক্রিয়া প্রতিনিয়তই দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অন্তর বায়ুকে akin to Electricity বলিয়াছেন। (একিন টু ইলেকট্রিসিটী) আমাদিগকেও এই প্রবন্ধে অন্তর বায়ুকেই ভালরূপ বুঝিয়া লইতে হইলে কেবল সুশ্রুতাদি সংহিতা লইয়া আলোচনা করিলে কৃতকার্য্যতা সিদ্ধ হইবেনা, কেননা চরক-সুশ্রুতাদি সংহিতা আর বাগভটাদি সংগ্রহ গ্রন্থে অন্তর বায়ুর আলোচনা বোধহয় সুস্পষ্ট হয় নাই। আমার উক্তি বোধ হয় ঠিক নহে। যেহেতু আমি নিয়মিতভাবে গুরুর নিকটে চরকাদি গ্রন্থ অর্থাৎ আয়ুশাস্ত্র অনুশীলন করি নাই। যাহারা আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত আলোচক—গুরুর নিকট সুশিক্ষিত, তাঁহারা এই বিষয়ের প্রকৃত অনু-সন্ধান করিবেন। আমার এই স্থানে ইহাই

বলা যথেষ্ট যে, অন্তর বায়ুর ক্রিয়া শারীর যন্ত্রের উচ্ছ্বাস প্রসারণের একমাত্র সহায়। ইহা প্রকৃত সত্য—অকাট্য ধ্রুব ধারণা।

এই অন্তর বায়ুর ক্রিয়া হিন্দু বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তন্ত্রশাস্ত্রে উৎকৃষ্টরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং আমরা বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা নামক ত্রিধাতুকে তন্ত্র সাহায্যেই বুঝিতে চেষ্টা করিব। অন্ততঃ আমার ন্যায় আয়ুর্ব্বেদে স্বল্প অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তন্ত্রের সাধারণ প্রচারিত ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ী আর স্বাধিষ্ঠান, মূলাধার, আজ্ঞচক্র অনাহত প্রভৃতি চক্র হইয়া ত্রিধাতুর পূর্ণ অস্তিত্ব এবং সত্যতা মূলক ক্রিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। যাহা তন্ত্রে বর্ণিত আছে—তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুযায়ী বুঝিতে হইলে জানিতে হইবে যে, Cerreberrospernal সেম্রিব্রোস্পাইনাল এবং Simpathetic nurve সিম্‌পেথেটিক নার্ভ সিসটেম্ ও তাহার plexus প্লেক্‌সাস বায়ু পিত্ত কফের সহিত এক। ডাক্তারি এই বিজ্ঞান বাক্য আর বায়ু পিত্ত কফের যে প্লেকসাস এক—ইহা পূর্ব্বোক্ত "প্রাচ্যপ্রতীচ্য সমন্বয় গ্রন্থে" বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে; উহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিতে ইচ্ছা করি না। আবার আমার তান্ত্রিক শিক্ষায় তাহা পার পাইয়াও উঠিবে না, মাত্র ত্রিধাতুর সমন্বয় করিয়া শিক্ষিত চিকিৎসক-লেখকগণের নিকট ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা শুনিবার যথেষ্ট আশা করি। এতদর্থে বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী কবিরাজগণের নিকট এই আশা সাধারণের বিশেষ প্রার্থনীয় নহে কি?

আয়ুর্ব্বেদের বাত্ বাহ্য বায়ুর ন্যায়, কিন্তু প্রকৃত বাহ্য বায়ু নহে। ইহার প্রকৃত স্বরূপ মহামুনি সুশ্রুত যাহা করিয়াছেন—তাহাই এই স্থানে আলোচনা করিব। যথা বায়ু অর্থাৎ গতি বা শক্তি ইহা পিত্তাশ্রিত। যে স্থানে Heat তাপ সেই স্থানেই বায়ু ক্রিয়াশীল, কেননা "তপ" ধাতু হইতে পিত্ত শব্দ নিষ্পন্ন। আর আলিঙ্গনার্থ "শ্লিষ ধাতু হইতে শ্লেষ্মা শব্দ ব্যুত্থিত। অগ্নি সাদন অর্থাৎ পাশ্চাত্য Cembustion কমবাসসন Excdation একসিডেসন ইহার নিয়ামক বা পরিচালক। ইহা "শৄ" শীর্ণ হওয়া ধাত্বার্থক বোধক। শরীর নিয়ত শীর্ণ হইয়াও কাষ্ঠাদির ন্যায় দগ্ধ হইয়া না যায়, প্রত্যুতঃ বল, বীর্য্য, উৎসাহ, কান্তি, শ্রী, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য বিকাশ ঘটে, তাহারি কার্য্য এই শ্লেষ্মা হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে হেতু বহুল পরিমাণ সোমগুণে আপ্যধাতু থাকিয়া এই মহা কার্য্য সিদ্ধ হয়।

আয়ুর্ব্বেদের এই মহান্ তত্ত্ব আজ প্রায় ২৫।৩০ বর্ষ হইল কোন উন্নতজ্ঞান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের দ্বারা ভিন্নভাবে প্রসার হইতেছে। পাশ্চাত্যের Maiter মরস্তার আর আয়ুর্ব্বেদের শ্লেষ্মায় যথেষ্ট সমতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু কিসে যে জীবদেহে লাবণ্য-শ্রী-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়—তাহা অদ্যাপি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নির্ণয় করিতে পারে নাই। সবে তাঁহারা আজ অতি অল্প দিন হইল বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, কেবল মনুষ্য দেহের Coraletion করোলেসন দ্বারা এই সুবৃহত কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। দুইটি রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা Sustentive সাসটেনটিভ কাংসন এর ক্রিয়া হইলেও Oexidation আর Combustions এর রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা তাপ উৎপাদন করে। লাবণ্য, কান্ত, শ্রী ইহারি

অন্তর্গত। সুখের কথা এই যে, এই তত্ত্ব কোন স্মরণাতীত কালে আর্য্য ঋষিগণ দ্বারা আবিস্কৃত হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার গণের Internal cicretion সিক্রেশন আর আমাদের কথিত শ্লেষ্মা তত্ত্ব একার্থ প্রতিপাদক। বস্তুতঃ পিত্ত এবং শ্লেষ্মা নিজে ক্ষমতা শূন্য পঙ্গু, ইহারা বায়ুদ্বারা পরিচালিত এবং পরিশোধিত। এই কথাটিকে একটুকু স্থির ধীর চিত্তে বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেহ তত্ত্বের এই মূলকেন্দ্রই বায়ু পিত্ত কফের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এখন কথা এই যে, যে শাস্ত্রে নরদেহের মূল কেন্দ্র এই ত্রিধাতুর আমূল আলোচন-অনুশীলন পূর্ণভাবে কীর্ত্তিত, সেই আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক হাতুড়িয়া প্রথা বলিতে যাহারা সাহসী এবং ইচ্ছুক, তাহাদিগকে কোন্ বিশেষণে যে প্রখ্যাত করিব তাহা সুধীগণই অনুমান করিবেন।

এই মহা বিজ্ঞান বিস্তারবোধিত ত্রিধাতুকে আমার সামান্য শিক্ষায় যে বিজ্ঞান সম্মত মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছি, ইহা এই প্রবন্ধের পাঠকগণ বোধহয় অতি অল্প কথায় জড়িত ভাবে বুঝিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা পরিষ্কৃত ভাবে এই সমস্ত তত্ত্ব বুঝান আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য। আর আমার দৃঢ় ধারণা এবং বিশ্বাস যে, এই আলোচনায় সুধীগন ত্রিধাতুর এবং মূল আয়ুর্ব্বেদের কতকটা বিজ্ঞানরহস্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

মানবের শরীর ব্যাধির মন্দির। এমন অনেক ব্যাধি আছে—যাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান অদ্যাপি বুঝিতেই পারে নাই। অথবা তাহার প্যাথলজি (নিদান তত্ত্ব) বুঝিতেই পারে নাই, আয়ুর্ব্বেদীয় বৈদ্যগণ সেই সকল দুর্ব্বোধ্য দুরারোগ্যব্যাধি অতি সহজে ত্রিধাতুর অভিজ্ঞতায় ও আয়ুর্ব্বেদানুশীলনে আরোগ্য করিতেছেন। ইহার বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায় তাহা করা হইল না। ইতিপূর্ব্বে একটী শিক্ষিত ডাক্তারের লিখিত উদরী পীড়ার দৃষ্টান্ত আয়ুর্ব্বেদে যাহা বাহির হইয়াছিল তাহা আমার এই প্রবন্ধের পোষকতা করিতে পারে। এইরূপ উদাহরণ অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে। অথবা ইহা বলা অধিক য, এই কথা আমার আয়ুর্ব্বেদ ভক্তি মুলকও নহে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট কাহিনী—দেখিয়াছি, একজন পাড়াগেঁয়ে "পেতের কবিরাজ" বিন্দুমাত্র সংস্কৃত না জানিয়া এমন কি বঙ্গভাষার অনুবাদিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ না পড়িয়া যে সকল ব্যাধি আরোগ্য করিতেছেন তাহা এই ত্রিধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত বেদ সংবদ্ধ বিধিবদ্ধ ঔষধের ক্রিয়া আর নাড়ী পরীক্ষায় বায়ু পিত্ত কফ বুঝিয়া প্রয়োগের প্রত্যক্ষ ফল।

এই মহা গৌরবময় বিজ্ঞান মূলক ত্রিধাতুর ক্রিয়া বুঝিয়া ভারতীয় ডাক্তারগণ যদি চিকিৎসা বিদ্যা প্রচার করেন, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া-প্লেগ-বসন্ত-কলেরা-পীড়িত দেশের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিতে অধিক দিন লাগিবে না। আমি যে ডাক্তার দিগকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করিতেছি তাহার কারণ এই যে, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ মহাশয়গণ সাধারণতঃ একদেশদর্শী ভাবে ঋষিগণ অনুষ্ঠিত কার্য্যে বসিয়া বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিপ্লাবিত দেশে আয়ুর্ব্বেদের বিজ্ঞান ভিত্তি সংস্থাপিত করিতে পারিবেন না। আবার এই কথাও

ঠিক যে কবিরাজমণ্ডলী দেশকালানুযায়ী পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন-পরিসংযোগ না করিলে নবাগত ব্যাধিগুলির নিরাময় করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেননা জগতের বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্যা আলোচিত দেশের অবাধ গতির মুখে বিনা যুক্তি তর্কে বাস্তবিক বিদ্যাবিহীনতায় শুধু ত্রিধাতুর মৌলিক গুণে পার পাইয়া উঠিবেন না। এ দিকে ডাক্তার মহাত্মাগণও শুধু মৃত শরীরের যন্ত্রগুণজ্ঞ হইয়া আর "শাদা জল হরিদ্রা জল" খাওয়াইয়া প্লেগ-কলেরা ইনফ্লুএনজা আরোগ্য করিতে পারিবেন না। এই কথার সত্যতা বিগত ইনফ্লুএনজা মহামারী। গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে, দেশ বিধ্বংস ইনফ্লুয়েনজা রোগ শতকরা ৯০জন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়াছে।

যাহা হউক আয়ুর্ব্বেদের বিজ্ঞান ভিত্তি লইয়া যাহা আলোচিত হইল ইহা হইতে যদি দেশীয় কিম্বা বিদেশীয় চিকিৎসক সম্প্রদায় আরও কিছু বিশদ ব্যাখ্যা সাধারণকে বুঝাইতে পারেন তাহা হইলে লেথক কৃতার্থ হইবেন।

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ বা

Practice of Medicine.

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

জীরকাদি মোদকঃ।

শ্লক্ষ্ণ চূর্ণীকৃতং জীরং পলাষ্টকমিতং শুভম্।
তদর্দ্ধং বিজয়াবীজং ভর্জ্জিতম্ বস্ত্র পূতকম্॥
অয়শ্চূর্ণং তথা বঙ্গমভ্রকং কর্ষমানতঃ।
মধুরিকাচ তালীশং জাতীকোষ ফলে তথা॥
ধান্যকং ত্রিফলাচৈব চাতুর্জ্জাত লবঙ্গকম্।
শৈলেয়ং চন্দনে দ্বে চ মাংসী দ্রাক্ষা শঠী তথা॥
টঙ্গনং কুন্দুরু যষ্টি তুগা কক্কোল বালকম্।
গাঙ্গেরুস্ত্রিকটু শ্চৈব ধাতকী বিল্বমর্জ্জুনম্॥
শতপুষ্পা দেবদারু কর্পূরং সপ্রিয়ঙ্গুকম্।
জীরকং শাল্মলীশ্চৈব ককা পদ্মনালুকে॥
এষা কর্ষ সমং চূর্ণং গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক।
শর্করা মধুনাজ্যেন মোদকঞ্চ বিমিশ্রিতম্॥

জীরাচূর্ণ ৬৪ তোলা, ঘৃতভর্জ্জিত ও বস্ত্রপূত সিদ্ধিবীজ চূর্ণ ৩২ তোলা, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালীশপত্র, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শিলাজতু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগা, কুন্দুরুখোটী, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাকোলী, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কটকী, পদ্মকাষ্ঠ ও লালুকা — এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটীর চূর্ণ ২ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। যথানিয়মে মোদক পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে ঘৃত ও মধুসহ মোদক